জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

তোমাদের মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

যে সংখ্যাটি নেই সেটি কি?

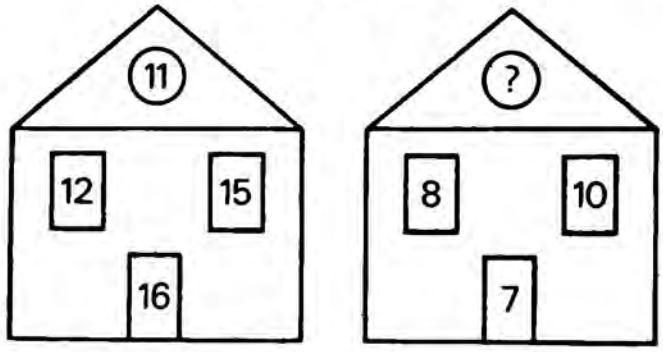

বড় স্পষ্ট হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে। এই ঠিকানায় পাঠাও:

"Fun with Gems"
Dept. A—23,
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
৩১শে মে ১৯৭৮

শিগ্‌গীর!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C161 -BEN

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, মে ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প

গয়াপতির বিপদ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭
লাটপঞ্চরের চোর-ভালুক। গঙ্গেশ বিশ্বাস ৩৬

ছড়া

একটি যাত্রী। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১১
রাম সিং। শান্ত রায় ১৯ ; ভূত-পাহাড়। চিত্তরথ দত্ত ৩৭

আত্মকথা

খেলতে-খেলতে। চুনী গোস্বামী ১৩

উপন্যাস

অলৌকিক। বিমল কর ১৭ ; বন্ধ ঘরের আওয়াজ। সমরেশ বসু ৩৯

বিশেষ রচনা

কাশীতে ফেলুদা। পার্থ বসু ৫ ; হিমালয়ান মোটর-র‍্যালি। বিশ্বজিৎ গুহ ২৩
পিনোশিয়োর নামে পার্ক। বিকাশ বসু ৪৩

কমিকস

গোয়েন্দা বাজ ২১ ; টারজান ২৬ ; টিনটিন ৩০ ; গাবলু ৪২ ; নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো

বিশ্ব-ফুটবলের নানা খবর। মুকুল দত্ত ৪৬
কেমন খেলবে তিন প্রধান। অশোক দাশগুপ্ত ৪৮
অপ্রিয় ইতিহাস। ফাইটার ৫০
হকিতে বিশ্বকাপ পেল পাকিস্তান। দ্বাদশ বাক্তি ৫১
ববির বিদায়। সুব্রত সরকার ৫২

লেখাপড়া

সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ১৬
হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য

শব্দ-সন্ধান ২৮ ; ধাঁধা ২৮ ; কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ; মজার খেলা ২৯ ; আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা

তোমাদের পাতা ২২ ; দুঃসাহসিক অভিযান ২৫
মণিমেলার খবর ৫২
আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ ; শেখো। কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ শ্রীমতী উষা প্রসাদ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি· আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

কাশীতে ফেলুদা

পার্থ বসু

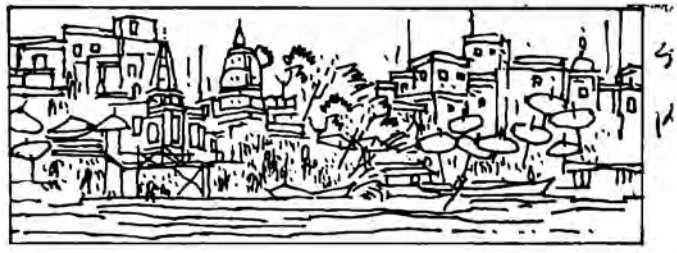

বারাণসীর গঙ্গার ওপারে তখনও সূর্য ওঠেনি। সেই সাতসকালে নদীর এপারের একটা বুরুজের উপর দাঁড়িয়ে আছে একজন—আমাদেরই চেনা লোক। ফেলুদা। কিছু দূরে একটা লোক গঙ্গায় স্নান করছে, ফেলুদা আড়চোখে তাকেই লক্ষ করে চলেছে। তারপর সেই লোকটার স্নান শেষ হল, ভিজে কাপড় আর গামছা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। ঘাটের উপরই এক মস্ত বাড়ি, গঙ্গার উপরে তার বারান্দা ঝুঁকে রয়েছে, ছাদের উপরেও আবার একটা টাওয়ারের মত—সেখানে একসময়ে লিফটে উঠবার ব্যবস্থা ছিল। এখন সে-বাড়িতে রক্ষী ছাড়া কেউ থাকে না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সেই প্রাসাদের মত বাড়িতে ঢুকল ফেলুদার টারগেট—সেই লোকটা। লোকটা বুঝি দরজাটা শুধু ভেজিয়ে রেখে ভিতরে গেল! ফেলুদা তাকে অনুসরণ করে অদ্ভুত সাহসে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। দোতলায় ভিতরের চওড়া বারান্দায় কিছু পুরনো আসবাবপত্র একদিকে ডাঁই করা ছিল—ফেলুদা পা টিপে-টিপে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে তার পিছনে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। সে কী দারুণ রুদ্ধশ্বাস সময়টা।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পের ফেলুদা এখন যে বারাণসীতে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে! বইটাও নিশ্চয় অনেকের পড়া—'জয় বাবা ফেলুনাথ'। সেই কাহিনীটি সিনেমায় তোলা হচ্ছে। পরিচালক তো লেখক স্বয়ং।

স্টুডিওর বাইরে রাস্তায় ঘাটে বাড়িতে যে মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়— সিনেমার ভাষায় তাকে বলে আউটডোর শুটিং। জয় বাবা ফেলুনাথ গল্পটির ঘটনাস্থল বারাণসী। তাই ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই দ্বারভাঙ্গা ঘাটে শুটিং আরম্ভ হল। প্রথমেই যে ঘটনাটা বলেছি সেটা এই আউটডোর শুটিংয়ের সূচনা। আর যে লোকটাকে ফেলুদা অনুসরণ করছিল, সে হল মছলিবাবা। এক ভণ্ড সন্ন্যাসী। আর বাড়িটা মছলিবাবার আস্তানা। এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখা ভাল। যে-কোনো গল্প যখন চলচ্চিত্রে দেখানো হয় তখন তাকে কিছু অদল-বদল করে নিতে হয়। লেখা একরকম পড়তে লাগে, তাকে দেখার মত করতে গেলে যদি লিখিত কাহিনীকে হুবহু অনুসরণ করা হয় তাহলে ঠিকঠাক সিনেমা হয় না। 'সোনার কেল্লা' বইটা পড়ে আর সিনেমাটি দেখেই বুঝতে পারবে, কী বলতে চাইছি। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' গল্পটিরও তাই অদল-বদল হয়েছে। সেটি সিনেমার প্রয়োজনেই করা হয়েছে। আমি অবশ্য সিনেমার গল্পটুকু বলে দেব না এক্ষুনি, তাহলে তো সিনেমা দেখার সাসপেন্স বা কৌতূহল একদম নষ্ট হয়ে যাবে। ফেলুদাকে অনুসরণ করব আমরা, বারাণসীতে, আর তার মধ্যেই জানা যাবে কীভাবে সেখানে আউটডোর শুটিং চলেছিল। আর সেখানেও সবটুকু বলা যাবে না। কিছু বাকি রাখলে সকলের পক্ষেই ভাল হবে।

সেদিন বিকেলে ছিল সরস্বতীপুজোর ভাসান। প্রায় শহর-কলকাতার মতই বারাণসীতেও অলিতে গলিতে স্কুলে কলেজে ক্লাবে মাঠে সরস্বতীপুজো হয়েছে। দুপুর থেকে প্রাচীন ঘাট দশাশ্বমেধে প্রচণ্ড ভিড়। তার পাশেই দ্বারভাঙ্গা ঘাটে বিকেলে দেখা গেল একটা বজরা এসে লাগল। টকটকে সবুজ রঙ, দরজার দুপাশে রঙিন সেপাই আঁকা। বজরার ছাদে এক ইজিচেয়ার, তাতে কালো লংকোট পরে হেলান দিয়ে বসে আছেন মগনলাল মেঘরাজ। শুটিং শেষে আমরা অনেকেই সেই বজরায় ঝপাঝপ

তোপসে আর বুকু ফোটো সন্দীপ রায়

উঠে পড়লাম। সত্যজিৎ রায় তো ছিলেনই, তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায়, ক্যামেরাম্যান সৌম্যেন্দু রায়, মেক-আপ করেন যিনি সেই অনন্ত দাশ, সোনার কেল্লার সেই কামু মুখার্জি ও আরও অনেকে ছিলেন। অভিনেতারা তো ছিলেনই। ক্যামেরা নিয়ে সন্দীপ রায় এদিক-ওদিক ফটো তুলতে লাগলেন। বজরায় বেশ খানিকক্ষণ ঘোরা হল আর সরস্বতী প্রতিমার বিসর্জনও দেখা হল।

পরদিন বিকেলে সেই ঘাটেই আরও অনেকক্ষণ শুটিং হল। কেননা, আরও নতুন চরিত্র সব এসে গেছেন। বিকেলের শান্ত আলোয় দেখা গেল ফেলুদা আসছেন, সঙ্গে তাঁর তিন সঙ্গী। একজন বিখ্যাত সেই টাকমাথা, সবুজ মোটা পাড়ের ধুতি-পরা লালমোহন, স্ট্রাইপড টেরিকটের শার্ট পরা তোপসে আর ফেলু-

দাদের হোটেলের ম্যানেজার। ম্যানেজারমশাই ডিটেকটিভ প্রদোষ মিত্তির আর বিখ্যাত লেখক জটায়ুকে বারাণসী চিনিয়ে বেড়াচ্ছেন, অতএব তাঁর মুখে সর্বদা একটা সগর্ব বিনয়ের হাসি। তিনি হঠাৎ হাত তুলে কাকে যেন ডাকলেন—অহল্যাবাঈ ঘাট থেকে এগিয়ে এলেন উমানাথ ঘোষাল আর তাঁর স্ত্রী। আলাপ-পরিচয় হল। জানা গেল, ঘোষালবাড়িতে এক বহুমূল্য গণেশমূর্তি চুরি গেছে। উমানাথবাবু ফেলুদাকে তাঁর বাড়ি যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন।

উমানাথ ঘোষালের বাড়ি যাওয়া যাক এবার। জায়গাটার নাম নাগোয়া। তার পাশের এলাকার নাম লঙ্কা, সেখানে রয়েছে বিখ্যাত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। এই বাড়িটা সত্যজিৎ রায়ের আরেক আশ্চর্য আবিষ্কার ! কংক্রিটের উঁচু-উঁচু থামের উপর বাড়িটা। চারতলা বাড়িটার চারপাশে বারান্দা আর খান-চল্লিশেক ঘর। এক ইওরোপীয় মহিলার তৈরি বাড়িটা। এখন কেউ থাকে না, কিন্তু চমৎকার রাখা আছে ঘর সিঁড়ি বারান্দা ছাদ। ছাদটাও উঁচু-নিচু সিঁড়িতে ভর্তি, পেছনে ধানখেত আর বিঘে দশেক শুধু গাঁদাফুলের বাগান। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। ছাদে উঠলে দেখা যায় গঙ্গাতীরের পুরো বারাণসীটা, নৌকো, গোল-গোল ছাতা, বিচিত্র সব সিঁড়ি, মন্দিরের চুড়োয় জমকালো হয়ে রয়েছে। সেই বাড়ির সামনের গেট দিয়ে ফেলুদার সদলবলে প্রবেশ। উমানাথবাবুর কর্মচারী বিকাশ তাঁদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। হঠাৎ 'দুম' শব্দে ফেলুদারা চমকে উঠলেন। বিকাশ চমকাল না। দেখা গেল ছাদের কার্নিসে রুকু দাঁড়িয়ে, তার হাতে পিস্তল। যে ছেলেটি রুকুর ভূমিকায় নেমেছে, সে কলকাতার নব নালন্দা ইস্কুলে পড়ে। চমৎকার অভিনয় করে গেল। পরপর তিনদিন এই বাড়িতে সারাদিন ধরে শুটিং হল। ছাদের চিলে-কোঠার ঘরে ছেলেমানুষি হাতের লেখায় লেখা রয়েছে—ক্যাপটেন স্পার্ক। রুকু নিজেকে ক্যাপটেন স্পার্ক মনে করে। সেখানে দাঁড়িয়ে একদিন ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, "ক্যাপটেন স্পার্ক থাকতে গণেশটা চুরি গেল ?" খড়খড়ির একটা ফাঁকে রুকুর মুখটা দেখা যাচ্ছে ; বলল, "সেটা তো চুরি যায়নি। সেটা আছে আফ্রিকার রাজার কাছে।" সে আবার কে? ফেলুদা তো বড্ড ধাঁধায় পড়লেন। আর সেটা বোঝা গেল একটা রাতে।

রাত তখন বারোটা দশ। মদনপুরা রোডের উপর পাণ্ডে-হাবেলি এলাকা, তার এদিক-ওদিকে ছড়ানো বাঙালিটোলা অর্থাৎ বেনারসের বাঙালিদের পাড়া। আর সেই পাণ্ডে-হাবেলির আঁকাবাকা গলি, অন্ধকার আর নির্জন, গলির দুধারে অনেক-কালের পুরনো বাড়ি। বাড়িগুলিও খুব উঁচু, শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোকেও ছাদে-ছাদে ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই নিরালা গলির একপ্রান্তে কথা বললে আরেক মোড়ে কথা-গুলি স্পষ্ট শোনা যায়। ফেলুদারা তিনজন অত রাতে সেই গলি দিয়ে চলেছেন। জটায়ুকে জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা, "আপনার কোনো বইতে আফ্রিকার রাজার কথা আছে ?" জটায়ু তার উত্তরে তাঁর 'গোরিলার গোগ্রাস' বইটার উল্লেখ করলেন। সেখানে জটায়ুর আরেকটা বইয়ের কথা এসে পড়ল, এল গলিতে দু পাশের বাড়িগুলির কথা, (জটায়ু বললেন : কী সব হনটেড বাড়ি, ভিতরে গিয়ে দেখবেন প্রত্যেকটার কড়িকাঠে শয়ে শয়ে বাদুড়-ঝুলছে) আর তাতেই ফেলুদা একটা কবিতার চারটে লাইন আবৃত্তি করলেন, "বাদুড় বলে ওরে ও ভাই শজারু..."। তোমরা অনেকে নিশ্চয় ধরতে পারবে যে, কবিতাটি কার। আর তারপরেই একটা ছোরা-ধরা হাত হঠাৎ ঝলসে উঠল সেই গলির একটা বাঁকে। রাত তিনটে অবধি সেখানে এতসব ঘটনা ক্যামেরায় ধরে রাখা হল। তারপরে তেরো দিন ধরে চলল সারা বারাণসী জুড়ে ফেলুদা আর তার দলবলের রহস্য-সন্ধান ও তার সমাধানের চেষ্টা। কতরকম ঘটনা আর কতরকম পরিবেশে যে বারাণসীতে ফেলুদাদের দেখা গেল, তার ফর্দই লম্বা হয়ে যাবে। বিশ্বনাথের সরু গলিতে রঙের সমারোহ—সেখানে ষাঁড় পাণ্ডা দোকানী তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ফেলুদারা, ঠঠেরি বাজারে বিখ্যাত রাবড়ির দোকানের সামনে ফেলুদা আর বিকাশ কখনও মানমন্দিরের সেইসব পুরনো যন্ত্রপাতির ফাঁক-ফোকরে—সেখানে আবার পুলিসের অভিনয়ও ছিল, কখনও বিশ্বনাথ মন্দিরের পিছনে জ্ঞানবাপীর বিশাল চত্বরে—সেখানে ক্যাট্‌কেটে সবুজ শার্ট-পরা মুসকোমতন একটা লোক ফেলুদাদের ফলো করছিল। আবার চকে গোপাল সাউর গলিতে মগনলালের মস্ত বড় বাড়ির সামনে চলে এলাম সবাই। সেখানে চমৎকার কারুকাজ-করা দরজার দুপাশে রঙ দিয়ে প্রহরী আঁকা রয়েছে—ঠিক যেমনটি বইতে বর্ণনা আছে, সেরকমই পাওয়া গেল। ফেলুদারা তার মধ্যে ঢুকে গেলেন, কখনো কেদারঘাটে—সেখানে মগনলালের সঙ্গে দেখা হবার পর একটা বুরুজের উপর ফেলুদা মনমরা হয়ে বসে আছে, আর চওড়া ঘাটের সরু সিঁড়ির উপর পায়চারি করতে-করতে লালমোহনবাবু বা জটায়ু তাকে দারুণ দারুণ সব সাহসের কথা শোনাচ্ছেন, কখনও আবার কাশী বিদ্যাপীঠ রোডের উপর পাশা-পাশি দুই সাইকেল রিকশয় ফেলুদারা তিনজন কথা বলতে-বলতে চলেছে। একটা দিন বৃষ্টিতে নষ্ট হল, কখনও আবার রোদ পালিয়ে যেত। আর সবসময় ফেলুদাদের চারপাশে ভিড় লেগে থাকত—লম্বা চওড়া ভানু ঘোষ দড়ি হাতে সে-ভিড় সামলাতেন। সন্ধ্যার সময় দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে লোকের ভিড়ের মধ্যে দেখা যেত লম্বা শরীর নিয়ে সত্যজিৎ রায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাঁধে ঝুলছে টেপ রেকরডার। পৃথিবীর সেই পুরনো শহরে তিনি নতুন ফেলুদাকে এনেছেন।

গয়াপতির বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দারোগা গয়াপতির ভারী ফ্যাসাদ। কিছুতেই তিনি ডাকাত ঝালুরামকে ধরতে পারছেন না। ধরা দূরে থাকুক, ঝালুরামের চেহারাটা কেমন, সে কালো না ফর্সা, লম্বা না বেঁটে, হাসিখুশি না গোমড়ামুখো, তাও তিনি জানেন না। অথচ সরকার জোর তাগাদা দিচ্ছেন, ঝালুরামকে ধরতে না পারলে গয়াপতির বদলি অবধারিত।

তা ঝালুরামকে ধরাও সোজা কথা নয়। তার বন্দুক-পিস্তল আছে, হাতি-ঘোড়া-মোটরগাড়ি আছে, ছদ্মবেশ ধরতেও সে খুব ওস্তাদ লোক। যাদের বাড়িতে ঝালুরাম ডাকাতি করেছে, তারা কেউ সঠিকভাবে ঝালুরামের চেহারার বর্ণনা দিতে পারে না। কেউ বলে লম্বা, কারো মতে বেঁটে, কেউ বলে ফর্সা, কারো দাবি কালো। এ পর্যন্ত পনেরোজন ঝালুরামের বিবরণ পাওয়া গেছে। কিন্তু গয়াপতি জানেন, ঝালুরাম এক এবং অদ্বিতীয়। গত দুবছর ধরে এই শান্তির এলাকাকে ঝালুরাম ভারী সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। বাড়ি লুটছে, দোকান লুটছে, আড়ত সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায়-ঘাটে লোকের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। এখন ঝালুরামের নাম শুনলে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কেউ চোখ বুজে ফেলে, কেউ ঘামতে থাকে, কেউ বা ঠাণ্ডা মেরে যায়।

ঝালুরামের আবির্ভাব হওয়ার আগে গয়াপতি সুখেই ছিলেন। মাছ-দুধ-ফল-সবজি-মাংস-ডিমের অভাব হত না। খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হত। রাতে ঘুমোতেন, দিনে ঘুমোতেন, প্রায় সারাক্ষণই একটা ঘুম-ঘুম ভাব লেগে থাকত তাঁর। মনটা খুব প্রশান্ত থাকত, চারদিকটা ভারী শান্তিময় ও সুন্দর ছিল। গয়াপতির বেশ একটা বড়সড় ভুঁড়ি হয়েছে, গায়ে-গতরে থলথল করছে চর্বি। ওঠা, হাঁটা, কাজকর্ম করা বা খাটা-খাটুনির অভ্যাসটাই মরে গেছে। ঠিক এই সময়ে একদিন দুম করে দুর্দান্ত ঝালুরাম তাঁর এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তছনছ করে দিল। প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও ঝালুরাম কিছু-না-কিছু করছেই। দুবছরে মোট সাতশো ত্রিশ দিনে সে এগারো শো বাহান্ন রকমের লুটপাট, ছিনতাই, জখম ইত্যাদি করেছে।

গয়াপতির খিদে ক্রমশ কমে আসছে। রাতে একটু আধটু ঘুম এখনো হয় বটে, কিন্তু দিনের ঘুমটা আর আসতে চায় না আজকাল। ঘুম-ঘুম ভাবটাও আর নেই। গয়াপতির বুড়ি মা আজকাল প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, "বড্ড রোগা হয়ে গেছিস গয়া। চোখের তলায় কালি পড়েছে, হাঁটার সময় তোর পেটটা আর আগের মতো দোল খায় না, জুতোর শব্দটাও তেমন দুমদাম করে হয় না।"

গয়াপতির গিন্নি আগে মোটা-মোটা সোনার বালা, চুড়ি,

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর। আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিত করতে আমাদের যে-কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

ছোটরা সবাই এসো আমাদের রিচি রোড ও গড়িয়া শাখায় তোমাদের

চিলড্রেন্‌স কাউন্টার-এ

- নিজের নামে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলো, পাশবই নাও।
- নিজের নামে টাকা জমা দাও, নিজের সইতে টাকা তোলো।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ৭ রেড ক্রশ প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
চেয়ারম্যান জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB /78

এগারো ভরির বিছে-হার পরে থাকতেন সবসময়। একদিন গয়াপতি দেখলেন, তাঁর গিন্নি সব গয়না খুলে রেখে শুধু দু গাছি করে সরু চুড়ি আর সুতোর মতো সরু হার পরে আছেন। গয়াপতি হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গয়না খুলে ফেলেছ যে?"

গিন্নি আমতা-আমতা করে বললেন, "সবাই বলছে চারদিকে খুব চোর-ডাকাতের উপদ্রব, গয়না দেখানোটা নাকি ঠিক নয়।"

শুনে গয়াপতি গুম মেরে গেলেন। দারোগার বউ চোর-ডাকাতের ভয় খাচ্ছে! তার মানে, গয়াপতির যোগ্যতায় তাঁর নিজের বউয়েরও বিশ্বাস নেই!

সেইদিন থেকে গয়াপতি মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঝালুরামের যে-কোনো খবর পেলেই ছুটে যান। কিন্তু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত হদিশ করে উঠতে পারেন না। সবাই আড়ালে দুয়ো দেয়।

সেবার সোনাগড়ের হাটের কাছে ঝালুরাম তার স্যাঙাতদের নিয়ে জড়ো হয়েছে বলে এক আড়কাঠির কাছে খবর পেয়ে গয়াপতি সদলবলে ছুটলেন। গিয়ে দেখেন নির্দিষ্ট জায়গায় এক খুনখুনে বুড়ি ঘরের মাটির দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। আড়কাঠি মাথা চুলকে বলল, "এই বুড়িটাই ঝালুরাম। ছদ্মবেশে রয়েছে বোধহয়।"

গয়াপতি সন্দেহের শেষ রাখলেন না। বুড়িকে ধরে তুলে নিয়ে এলেন থানায়। বুড়ি পরিত্রাহি শাপশাপান্ত করতে থাকে। খবর পেয়ে শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে কাণ্ড দেখে হাসির ছররায় গয়াপতিকে ঘায়েল করে চলে গেলেন।

আবার আর-এক চরের কাছে খবর পেয়ে গয়াপতি চুপিসাড়ে কলসিপোঁতা গাঁয়ের চাকলাদারদের নারকোলবাগানে হাজির হলেন। খবর ছিল, মরা নারকোলগাছের নীচে ঝালুরাম সাধু সেজে বসে আছে। গয়াপতি সাধুর লেংটিরও সন্ধান পেলেন না, তবে সেখানে ধুনির ছাই খানিকটা ছিল বটে। যে লোকটা খবর এনেছিল, সে বলল, "এই নারকোলগাছটাই আজ্ঞে ঝালুরাম। এটাকে গ্রেফতার করুন।"

শুনে গয়াপতির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। লোকটাকে কান ধরে কয়েকটা চড়-চাপড় দিলেন। পরে কিন্তু খবর পেয়েছিলেন যে, লোকটা মিথ্যে বলেনি। মরা নারকোলগাছের ফাঁপা খোলের মধ্যেই নাকি ঝালুরাম গা ঢাকা দিয়েছিল। কদিন বাদে গিয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই নারকোলগাছের গায়ে একটা চৌকো দরজা। সেটা খুললে ভিতরে দিব্যি একজন সেঁধোতে পারে। ফলে গয়াপতির এক গাল মাছি।

হরগঞ্জের শ্রীপতি হাজরা এসে একদিন বলল, "হুজুর, আমার কেলে গরুটা পাচ্ছি না। তার জায়গায় গোয়ালে একটা রাঙা গাই কে বেঁধে রেখে গেছে। বড় সন্দেহ হয়, রাঙা গাইটার ভাবগতিক দেখে। গরুর মতো ডাকে না, খোল ভুষি ঘাস এসব খেতে চায় না। ভাত দিলে খায়। মনে হচ্ছে গরুর ছদ্মবেশেই না আবার ঝালুরাম এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

ছুটলেন গয়াপতি। গরুটার ওপর অনেক খোঁচাখুঁচি চলল। শেষে পাশের গাঁ হরবল্লভপুরের রহমত খবর পেয়ে ধেয়ে এসে গয়াপতির পায়ে পড়ে বলল, "হুজুর, ওটা ঝালুরাম নয়, নির্যস গরুই বটে। ও হল আমার দুলালি। শ্রীপতিদার কেলে গাই আমার গোয়ালে বাঁধা রয়েছে।"

গয়াপতি দমে গিয়ে বললেন, "হুম্!"

ঝালুরামের পিছনে দৌড়ঝাঁপ করতে-করতে গয়াপতি বাস্তবিকই টসকে গেছেন। জীপগাড়িতে চড়ে তাঁর গায়ে-গতরে প্রচণ্ড ব্যথা। ইদানীং দুর্গম জায়গায় যেতে হয় বলে ঘোড়াতেও

চড়তে হচ্ছে। তার ফলে মাজায় বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝালুরামের কথা ভাবতে ভাবতে সবসময়ে এমন দাঁত কিড়মিড় করেন যে, দুটো বুড়ো দাঁত নড়ে গেল। আজকাল এমন সন্দেহবাই হয়েছে যে, থানার সেপাই, বাড়ির চাকর, এমন কী নিজের মা বা বউকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না। এরা যে-কেউই ঝালুরাম হতে পারে বলে আজকাল তাঁর সন্দেহ হয়। হাতে সবসময়ে খোলা রিভলভার। খেতে, শুতে, স্নান করতে বা বাথরুমে যেতেও হাতে সেটা থাকে। ফলে কেউ ভয়ে তাঁর কাছে ঘেঁষে না।

কাণ্ড দেখে গয়াপতির মা ঝালুরামকে উদ্দেশ করে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন, "কেন রে খ্যাংরাগুঁফো, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস? তোকে সাপে বাঘে খায় না রে? না খায় তো আমার সুমুখে একবার আয় দেখি বুক চিতিয়ে, ঝ্যাঁটা দিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিই। বদমাশ কোথাকার, আমার বাছা খুঁজে-খুঁজে হেঁদিয়ে পড়ল, আর কোন্ আক্কেলে তুই তার চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিস? বাছা আমার যেমন না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে রোগা হয়ে গেল, তোরও তাই হোক। শুকিয়ে আমসি হয়ে যা, না খেয়ে উপোসি থেকে তোর পেট-পিঠের চামড়ায় ঘষাঘষি হোক।"

গয়াপতির গিন্নি গিয়ে হেকমতপুরের জাগ্রত কালীবাড়িতে জোড়া পাঁঠা মানত করে এলেন। শুনে গয়াপতির মা বললেন, "জোড়া পাঁঠা কি গো, ঝালুরাম ধরা পড়লে আমি জোড়া মোষ দেব। তাতেও না হলে জোড়া হাতি দেব, এই বলে রাখলাম।"

গয়াপতি সবই শুনেছেন এবং বুঝেছেন। তিনি যে ঝালুরামকে ধরতে পারবেন এ বিশ্বাস কারো নেই। সেটা বুঝতে পেরে তিনি আরও গুম হয়ে যান। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

একদিন সকালে থানায় নিজের অফিসঘরে বসে যখন এমনি ভাবেই ভাবছিলেন, তখন হঠাৎ একটা লম্বা-চওড়া লোক ঘরে ঢুকেই তাঁর বুকের দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বলল, "হাত তুলুন।"

গয়াপতি রিভলভার সুদ্ধু হাত ওপরে তুলে সভয়ে বললেন, "মেরো না বাবা ঝালুরাম!"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি ঝালুরাম নই, আর আপনাকে মারার ইচ্ছেও নেই। তবে আমি শুনেছি যে, আজকাল আপনি সবসময়ে রিভলভার বাগিয়ে থাকেন আর সবাইকে সন্দেহ করেন। তাই প্রাণের ভয়ে একটু ভয় দেখাতে হল। এখন আপনি যদি আপনার রিভলভারটা খাপে ভরেন, আমিও আমারটা পকেটে পুরব।"

গয়াপতি হাঁফ ছেড়ে রিভলভার খাপে ঢোকালেন। লোকটাও কথামতো কাজ করল। তারপর বসে এক গাল হেসে বলল, "আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ। নরনাথ চাটুজ্যে আমাকে ভাড়া করে এনেছেন তাঁদের বাড়ির সোনার হংসেশ্বরীর মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য। তাঁদের ভয়, ডাকাত ঝালুরাম মূর্তিটা লুট করবে।"

গয়াপতি নাক সিঁটকোলেন। প্রাইভেট গোয়েন্দা বরদাচরণের নাম তিনি শুনেছেন। লোকটা লাউচুরি, গরুচুরি বা বড় জোর ছেলেচুরির কেস করে। তাই গয়াপতি খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "ঝালুরামের ব্যবস্থা আমিই করব। আর কারো এখানে নাক গলাতে হবে না।"

বরদাচরণ মৃদু হেসে বললেন, "আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি আজকাল লাউচুরি, গরুচুরির মতো ছোটোখাটো কেস নিই না। মাত্র দু মাস আগে আমি একটা পুকুরচুরি ধরেছি।"

গয়াপতি চমকে গিয়ে বললেন, "বটে?"

"তবে আর বলছি কী? গয়েরকাটার রাম সিংয়ের বাড়ির ঈশান কোণের মস্ত পুকুর রাতারাতি চুরি হয়ে গেল। রাতেও টলটলে জল ছিল তাতে। সকালে দেখা গেল বিশাল গর্ত পড়ে আছে। জল তো নেই-ই, অন্তত বিশ মন মাছও সেই সঙ্গে উধাও। তিন দিনের মধ্যে ধরে ফেললাম, রাম সিংয়ের এক জ্ঞাতি ভাই রাবণ সিং বাড়ির সবাইকে সিদ্ধির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায়। তারপর রাতে ডিজেল পাম্প চালিয়ে পুকুরের সব জল নিজের একটা মজা দিঘিতে চালান করে এবং বিশ মন মাছ নিয়ে গিয়ে শহরে বেচে দেয়। আরো শুনবেন? মাত্র একমাস আগে আমি দুটো আন্তর্জাতিক চোরাই চালানের দলকে ধরি। আমেরিকার বড়লোকেরা বায়না ধরেছে তাজমহল এবং এভারেস্ট চাই। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেবে তার জন্য। মাসখানেক আগে এক অমাবস্যার রাত্রে চারটে লোক আমেরিকায় চালান দেওয়ার জন্য তাজমহলের ভিত খুঁড়ছিল। তক্কে-তক্কে আমি গিয়ে পালের গোদাকে চেপে ধরি। বাকি তিনজন পালায় বটে, কিন্তু হাতের ছাপ সহ শাবল ফেলে যায়। সেবারের মতো তাজমহল আমেরিকায় চালান হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় এবং পুরো দলটাই ধরা পড়ে। তার কিছুদিনের মধ্যেই নেপাল গভরমেন্টের ডাকে নেপালে গিয়ে আমি এভারেস্ট চুরিও আটকাই। চোরেরা এভারেস্ট শৃঙ্গ ভেঙে টুকরো করে সাধারণ পাথর হিসেবে আমেরিকায় চালান দিচ্ছিল। আমেরিকায় পাথরের চালান যাচ্ছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়। আমেরিকায় তো পাথরের অভাব নেই। তাই চালানের পাথর পরীক্ষা করেই আমি বুঝতে পারলাম, এ সাধারণ পাথর নয়। সেগুলোর গায়ে তখনো বরফ লেগে আছে। অনুসন্ধানে পুরো দলটাই ধরা পড়ল। নেপাল গভরমেন্ট গোপনে জাপান থেকে ইনজিনীয়ার আনিয়ে টুকরো পাথর সিমেন্টে জুড়ে ফের এভারেস্ট শৃঙ্গ রাতারাতি মেরামত করে ফেলল। সুতরাং....."

গয়াপতি বহুদিন বাদে এই প্রথম একটু হাসলেন। বললেন, "আপনি কি ঘনাদার কেউ হন?"

গোয়েন্দা বরদাচরণ ঘনাদার গল্প পড়েননি। আসলে গোয়েন্দাগিরি করে পড়াশুনোর সময়ও পান না। তবু ভাবলেন, ঘনাদা বোধহয় একজন কেওকেটা হবে। তাই পিছপা না হয়ে বললেন, "দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই।"

যাই হোক, এরপর গয়াপতি আর বরদাচরণের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দুজনে গোপনে নানারকম পরামর্শ আঁটতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যে খবর রটে গেল যে, দারোগা গয়াপতি নিখোঁজ হয়েছেন। ওদিকে চাটুজ্যে-বাড়ির সোনার হংসেশ্বরী মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য শহর থেকে যে গোয়েন্দাকে আনানো হয়েছিল, সেও বেপাত্তা। ফলে চারদিকে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই বুঝল, এ হচ্ছে ঝালুরামের কাজ। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত ভাবনায় পড়ে গেলেন।

ওদিকে ভাবনায় পড়েছে স্বয়ং ঝালুরামও। এতকাল এ এলাকায় সে-ই ছিল এক ডাকাত-সম্রাট। কিন্তু দিন সাতেক হল সে এমন তিন-চারটে ডাকাতির খবর পেয়েছে, যেগুলো তার দলের কাজ নয়। ঝালুরামের এলাকায় তার অনুমতি না নিয়ে ডাকাতি করবে, এত সাহস কার! ঝালুরামের খাওয়া কমে গেছে, ঘুম ছুটে গেছে। চারদিকে তার চরেরা নতুন ডাকাতদের খোঁজ নিচ্ছে।

মনসাপোতার গভীর জঙ্গলের ভিতর এক ভাঙা মন্দিরে ঝালুরামের আস্তানায় এক রাত্রে দুজন লোককে ধরে আনা হল। একজন মোটাসোটা, থলথলে। অন্যজন বেশ লম্বা-চওড়া। ঝালুরাম মশালের আলোয় চোখ দিয়ে দুজনকে ভাল করে মেপে

দেখল। তারপর হুংকার দিয়ে বলে উঠল, "তোরাই ডাকাত?"

ঝালুরাম দেখতে রোগা ল্যাকপ্যাক সিং। মাথায় তেমন উঁচুও নয়। কিন্তু তার হুংকার শুনলে মালুম হয়, যন্ত্রটা ছোট হলেও বিপজ্জনক।

লোক দুটো কেঁপে ঝেঁপে বলল, "আজ্ঞে"।

ঝালুরাম অট্টহাসি হেসে ওঠে। লম্বা লোকটা ভয়ে-ভয়ে বলে, "হুজুর, আমাদের কেউ দলে নেয়নি বলে দুজনে মিলে ছোটোখাটো কাজ করি। কিন্তু আপনার মতো মহান ডাকাত যদি আমাদের দলে ভর্তি করে নেন, তবে আমরা আলাদা কাজ কারবার ছেড়ে দেব।"

ঝালুরাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলে, "আমার দলে ডাকাতি করবি? দেখি তোদের এলেম! দুজনে পঞ্চাশটা করে ডিগবাজি খা।"

ডিগবাজি খেতে খেতে লোকদুটো হেঁদিয়ে জিভ বার করে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাতে লাগল। ঝালুরাম হেসে লুটোপুটি, সেই সঙ্গে তার পঞ্চাশজন স্যাঙাতও।

এরপর ঝালুরাম হুকুম দেয়, "রণপায়ে চড়ে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে আয়...দু মাইল দৌড় দে...স্রোতের নদী সাঁতরে পার হ...সুপুরি গাছ বেয়ে ওঠ...বিশ হাত ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়...লাঠি তরোয়াল আর রাম-দা চালিয়ে দেখা... বন্দুকের নিশানা দেখা অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানে মড়ার খুলি কোলে নিয়ে বসে থাক্..."

আর এই সব হুকুম তামিল করতে করতে লোক দুটোর জান কয়লা। প্রাণপাখি খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। আড়ালে মোটা লোকটা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠে, "ইচ্ছে করে, দৌড়ে গিয়ে বেটার টুঁটি টিপে ধরি।" লম্বা লোকটা তখন তার হাত চেপে ধরে চুপি-চুপি বলে, "না গয়াবাবু, এখন নয়। সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। অপেক্ষা করুন।"

সব কিছুরই শেষ আছে। লোকদুটোর ট্রেনিংও একদিন শেষ হল। ঝালুরাম তাদের ডেকে বললে, "তোদের দিয়ে কোনরকমে কাজ চলতে পারে। আজ আমরা চাটুজ্যে-বাড়ির হংসেশ্বরীর সোনার মূর্তি লুট করতে যাচ্ছি। তোরাও থাকবি দলে। আজ তোদের পরীক্ষা।"

শুনে ছদ্মবেশী গয়াবাবু আবার দাঁত কিড়মিড় করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বরদাচরণ ঠিক সময়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিলেন।

নিশুত রাতে ঝালুরামের দল চাটুজ্যে-বাড়ি ঘিরে ফেলল। 'রে রে' করে চেঁচাচ্ছে ডাকাতরা। আর সে চেঁচানি এমন সাঙ্ঘাতিক যে, মাটি সুদ্ধু কাঁপতে থাকে। চাটুজ্যে-বাড়ির ভিতরে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। ঝালুরাম নাক সিঁটকে বলল, "এ বড় ছোট ডাকাতি। ছোটলোকদের কাজ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। নতুন দুটোকে ডাক তো।"

নতুন দুজন এগিয়ে এলে ঝালুরাম বলল, "আজ আর আমরা হাত লাগাচ্ছি না। আমার দলবল বাড়ি ঘিরে রইল। আমি ওদিকের বটগাছতলায় মাদুর পেতে ঘুমোতে যাচ্ছি। তোরা দুজনে বাড়িতে ঢুকে সব চেঁছে-পুঁছে নিয়ে আয় গে যা। মনে রাখিস, হংসেশ্বরীর মূর্তিটা আনতে যেন ভুল না হয়। আধঘন্টার বেশি সময় দেব না কিন্তু। চটপট যা।"

হুকুম পেয়ে দুজনে গিয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই গয়াপতি বললেন, "বরদাবাবু! এখন উপায়?"

বরদাচরণ ভ্রু কুঁচকে ভাবিত মুখে বললেন, "হুকুম-মতো কাজ করে যান। অন্য উপায় তো দেখছি না।"

"কিন্তু আমি যে কখনো সত্যিকারের ডাকাতি করিনি! বাধো-বাধো ঠেকছে যে!"

বরদাচরণ দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "আর আমিই বুঝি করেছি!"

গয়াপতি বিরসমুখে বলেন, "তা সত্যি কথা বলতে কী, ডাকাতির ট্রেনিং নেওয়ার সময় আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল এ-ব্যাপারে আপনার কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। আমার চেয়ে সব বিষয়েই আপনি বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার ওপর এখন আবার ডাকাতিতেও বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।"

বরদাচরণ শ্লেষের হাসি হেসে বলেন, "গয়াবাবু, ডাকাতরা তো রাতে ডাকাতি করে, কিন্তু এখানকার লোক জানে যে, আপনি এখানে দিনে ডাকাতি করতেন। রোজ মাছ দুধ পাঁঠা মুর্গি ভেট নিতেন, প্রতি মাসে নগদ টাকায় নিয়মিত ঘুষ খেয়েছেন। কাজেই এই ছোটখাটো একটা ডাকাতিতে আপনার লজ্জার কারণ দেখছি না।"

গয়াপতি প্রচন্ড রেগে গিয়ে বলেন, "একটা প্রাইভেট গুলবাজ টিকটিকির এত বড় আস্পদ্দা! কালই তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই এলাকা থেকে বের করে দেব।"

বরদাচরণ সমান তেজে বলেন, "বেশি চালাকি কোরো না হে গয়াপতি, বাইরে ঝালুরাম মোতায়েন আছে। যদি বলে দিই যে, তুমি আসলে অপদার্থ দারোগা গয়াপতি, তবে সে হেঁসো দিয়ে তোমার পেট ফাঁসাবে।"

ঝালুরামের উল্লেখে গয়াপতি কিছু মিইয়ে গেলেন। সাত্য বটে, ঝালুরামের দল এখন ঘিরে আছে চারদিক। গড়বড় করলে বিপদ হতে পারে।

গয়াপতি শ্বাস ছেড়ে বলেন, "ঝালুরামকে আমিও বলে দেব যে, তুমি প্রাইভেট গোয়েন্দা বরদাচরণ। তোমারও গর্দান যাবে।"

এইভাবে দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল। হঠাৎ চাটুজ্যে-বাড়ির বড় ঘড়িতে একটা বাজার টং শব্দ হতেই দুজনে সচেতন হলেন। সময় বেশি নেই। ঝালুরাম মোটে আধঘন্টা সময় দিয়েছে।

বরদাচরণ বললেন, "ঝগড়াটা এখন মুলতুবি থাক গয়াবাবু। হাতে কাজ রয়েছে, বাইরে ঝালুরাম।"

গয়াপতিও মাথা নেড়ে বলেন, "থাকল। কিন্তু আপনাকে এই বলে রাখলাম, এসব ঝামেলা মিটে গেলে একদিন আপনার সঙ্গে আমার কুস্তি হবে। দেখব তখন কার কত ক্ষমতা!"

"আমিও দেখব। আমি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট।"

"বেল্ট আমারও আছে।"

বরদাচরণ হেসে বলেন, "সে বেল্ট তো ঝোলা ভুঁড়ি বাঁধার জন্য। জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট তা নয়। অনেক প্যাঁচ পয়জার শেখার পর ব্ল্যাক বেল্ট দেওয়া হয়। ওটা একটা মস্ত সম্মান।"

"রাখো রাখো। সম্মান দেখিও না। এ এলাকায় আমি রাস্তায় বেরোলে লোকে পথ ছেড়ে দেয় জানো?"

"জানি। পাছে তোমার ছায়া মাড়াতে হয় সেই ঘেন্নায় লোকে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।" বরদাচরণ বলেন।

ঝগড়াটা ফের পাকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু বাইরে ঝালুরামের একটা হুহুংকার শোনা গেল এই সময়ে, "কই রে! হল তোদের?"

কেঁপে উঠে দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন।

গয়াপতি বলেন, "বরদাবাবু! আর দেরি নয়।"

বরদাবাবুও বলেন, "না। আর দেরি করা মোটেই ঠিক নয়।" কাঁপতে-কাঁপতে গয়াপতি চলেন, তাঁর দু পা আগে আগে বরদাচরণ। বরদাচরণ কাঁপছেন না বটে, কিন্তু একটু ঘামছেন। বাগান পার হয়ে সদর দরজায় পৌঁছে দুজনেই মুশকিলে পড়লেন। সদর দরজা বন্ধ। কী করে বন্ধ দরজা বাইরে থেকে খুলতে হয় তা ঝালুরাম তাঁদের শিখিয়ে দেয়নি।

"এখন উপায়!" গয়াপতি বলেন।

"তাই তো!" বরদাচরণও ভাবিত হলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, "আরে দূর! খুব সোজা ব্যাপার। আমি তো গোয়েন্দা বরদাচরণ। চাটুজ্যে-বাড়ির সবাই আমাকে জানে।"

"আমাকেও।" গয়াপতি হার মানেন না।

"তাহলে আর মুশকিল কিসের? পরিচয় দিলেই দরজা খুলে দেবে।"

তাই হল। ধুতির খুঁটে মুখের কালি মুছে, ছদ্মবেশের পরচুলা, নকল গোঁফ, লম্বা জুলপি খুলে ফেললেন দুজনে। গয়াপতি একটা নকল আঁচিল গালে লাগিয়েছিলেন, সেটা খুঁটে তুলে ফেললেন। বরদাচরণ খানিক প্লাস্টার দিয়ে নিজের নাকটাকে বড় বানিয়েছিলেন, প্লাস্টারটুকু তিনিও টান মেরে খুলে ফেললেন। তারপর দুজনে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁদের গলার স্বর কারো অচেনা নয়। খানিক বাদে নরনাথ চাটুজ্যে দরজা খুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বললেন, "যাক, আপনারা এসে গেছেন তাহলে?"

গয়াপতি সঙ্গে-সঙ্গে চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেন। আর বরদাচরণ চাটুজ্যেকে বেঁধে ফেলেন চটপট। চাটুজ্যে শুধু করুণ চোখে চেয়ে বললেন, "কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আমার ঠাকুর্দা কথাটা বলতেন।"

এরপর লুটতরাজ খুবই সহজ হয়ে গেল। বাধা দেওয়ার কেউই ছিল না। যে যার প্রাণভয়ে ব্যস্ত। আধঘন্টার মাথায় বমাল গয়াপতি আর বরদাচরণ হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন। বেরোবার আগে দুজনেই অবশ্য তাঁদের ছদ্মবেশ পরে নিয়েছেন।

বরদাচরণের হাতে সোনার মূর্তিটা দেখে ঝালুরাম তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে "সাবাস!"

গয়াপতি একটু তেতো গলায় বলেন, "হুঁঃ! ও ওটা আনতে পারত নাকি? মূর্তিটা শানের ভিতে গাঁথা ছিল। আমি টেনে হিঁচড়ে না নড়ালে ওর একার সাধ্য ছিল না।"

ঝালুরাম গয়াপতিরও পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "তোরও এলেম কম নয়। কতগুলো সোনার গয়না এনেছিস!"

শুনে বরদাচরণ বললেন, "গয়না খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি যদি ওর পেটে থাকত! ডাকাত পড়ার খবর পেয়েই মেয়েরা সব কচুবনে গয়না ফেলে দিয়েছিল। আমিই বুদ্ধি করে বের করি।"

ঝালুরাম তখন আবার বরদাচরণের পিঠ চাপড়ায়। তাতে গয়াপতি ফুঁসে উঠে বলেন, "চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেছিল কে শুনি! তোমার সাহস হত?"

বরদাচরণ বলেন, "আর চাটুজ্যেকে বাঁধল কে? সেটাও জোর গলায় বলো।"

এইভাবেই দুজনে প্রচন্ড ঝগড়ায় লেগে পড়েন। ডাকাতরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের ঝগড়া দেখে। ঝালুরাম দুজনেরই পিঠ চাপড়ে একবার একে আর একবার ওকে সাবাস দিতে থাকে। কিন্তু ঝগড়া তাতে বাড়ে বই কমে না। একে সাবাস দিলে ও চটে ওঠে, ওকে দিলে এ ফুঁসে ওঠে। চেঁচানির চোটে সারা গঞ্জের ঘুম ছুটে যায়। আর কখন যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিস নিয়ে এসে গোটা দলটাকে ঘিরে ফেলেছেন তাও ডাকাতরা ভালমতো টের পায় না।

গয়াপতির মা দু-দুটো মানত করেছিলেন। ঝালুরাম ধরা পড়লে জোড়া হাতি দেবেন, আর নিরুদ্দেশ গয়াপতি ফিরে এলে জোড়া উট।

কিন্তু শস্তায় হাতি বা উট পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

ছবি সুধীর মৈত্র

একটি যাত্রী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কাঁপে মিনিবাস। কে তাকে নাচায়? রাস্তা, আবার কে?
যাত্রীর দল রেগে নেমে গেল তিনকোনা পার্কে।

রাস্তাটা নাচে। কে তাকে নাচায়? নাচাচ্ছে মিনিবাস—
একটি যাত্রী নোটবুকে তার লেখে সেই ইতিহাস।

নাচে ইতিহাস। কে তাকে নাচায়? কোন্ সে প্যাসেঞ্জার?
এই নিয়ে মাতে তেকোনা পার্কে যাত্রীর সংসার।

কোণে পড়েছিল হাঁড়িকুঁড়ি আর উনুন কয়লাকাঠ,
বনে গেল পার্ক এক মুহূর্তে চড়ুইভাতির মাঠ।

সেইখানে নাচে সহযাত্রীরা চড়ুইভাতির নাচ,
একটি যাত্রী নাচে না, বাকিরা তাকে বলে 'ধড়িবাজ'।

তার দোষ তার মস্ত চশমা, চক্ষে কিসের ঘোর,
তার দোষ তার বয়সের নাকি নেই রে গাছপাথর।

তার দোষ সে তো নাচতে পারে না, হাতে তার বারোমাস
ছোট্ট ডায়েরি, তাতে টুকে রাখে সমস্ত ইতিহাস!

ছবি অনুপ রায়

শিশুদের– কিশোরদের– যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্‌পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০
শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০
বিমল কর
ওআওার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·৫০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহশন ৩·০০
গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·৫০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০
শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·৫০
মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০
বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·৫০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০
সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০
সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৩·০০
মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী

খুব বেশীদিন সাহিত্য রচনা করছেন এমন নয়। তবু এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন কিশোরসাহিত্যের অতি প্রিয় এবং অপরিহার্য একটি নাম। বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করার মতো নির্ভরযোগ্য বই এমনিতেই বাংলা-ভাষায় কম। পার্থসারথি চক্রবর্তী শুধু যে সেই অভাবই পূরণ করছেন তাই নয়, বিষয়কে সরস এবং মজাদার, কৌতূহলকর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় কোন জাদুতে তাও তাঁর অজানা নয়। ছোটদের মহলে তাই তাঁর বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর কয়েকটি বই

ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০

রসায়নের ভেলকি ৩·০০

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০

কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০

পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০
গাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০
পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০
ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬·০০
মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০
সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০
নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুস্ট্যাল ১০·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার শেলক ৪·০০
লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০
অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০
আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০
সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০
অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০
সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অস্ত্রখনি ৫·০০
বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০
শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০
অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে রারুই হৈ ৫·০০
মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০
রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৮ ॥

১৯৭৪ সালের কথা। এশিয়ান গেমসে ভারতের দল গড়ার ব্যাপারে আমাকে যেতে হয়েছিল বাঙ্গালোরে। সঙ্গে ছিল অরুণ ঘোষ। আমি গিয়েছিলুম নির্বাচক হিসাবে, অরুণ ট্রেনিং ক্যাম্পের একজন কোচ হিসাবে। ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজের এক শুভানুধ্যায়ীর বাড়িতে আমরা রাত কাটাচ্ছিলুম। পরের দিন কলকাতায় ফিরে আসার কথা।

বাড়ির ভৃত্য খুব ভোরে আমাদের ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে কড়া নাড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। ভৃত্যটি বলল, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ঘুমজড়িত চোখে অরুণ বলল, "এত ভোরে কে এল বাবা ঘুম ভাঙাতে!" ভৃত্যটি বলল, "আমেদ খাঁ।"

আমি তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। আ-মে-দ খাঁ। আমার ছেলেবেলার সেই হীরো, জাতীয় ফুটবলে আমার প্রথম অধিনায়ক আমেদ খাঁ! একটা সুখস্মৃতিতে আমার মন যেমন আনন্দে ভরে উঠল, তেমন একটু অভিমানও হল অরুণের উপর। ও তখনো বিছানায় শুয়ে ভোরের সুখ-ঘুমের চেষ্টা করছে। একটু পরেই ভাবলুম, না, অরুণের তো দোষ নেই। ও হয়তো আমেদের গৌরব-লগ্নের খেলা দেখেনি। আমেদের সঙ্গে খেলেওনি। হৃদ্যতাও হয়তো নেই। আমার অনুভূতি ওর মধ্যে আসবে কী করে? ততক্ষণে আমেদ আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে অভিযোগ করছেন, বাঙ্গালোরে এসে তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করিনি? অরুণও উঠে পড়ে ফুটবলের আলোচনায় মেতে উঠেছে।

আমি তখন ভাবছিলুম—পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে কলকাতা-ফুটবলের এই সেই প্রবাদ-পুরুষ আমেদ খাঁ, যাঁর খেলা আমি স্বপ্নে দেখতুম, যাঁর মত খেলোয়াড় হতে চাইতুম। ওঁর খেলার অননুকরণীয় ভঙ্গি, অপূর্ব বল-কণ্ট্রোল এবং প্রতিপক্ষকে সম্মোহিত করে বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দেখে আমি অবাক হয়ে যেতুম। বিশেষ করে মুগ্ধ হয়েছিলুম ১৯৪৯ সালে সুইডেনের হেলসিংবর্গ দলের বিরুদ্ধে আমেদ খাঁর কল্পনাতীত বল-কণ্ট্রোল দেখে। কলকাতায় সেই প্রথম তিন ব্যাক প্রথায় খেলেছিল হেলসিংবর্গ দল। স্টপার ব্যাকে অ্যাপলটফ্‌ট নামে দীর্ঘদেহী এক খেলোয়াড়ের খেলার ছবিও আমার মনের পর্দায় তোলা আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে আমেদ খাঁই আমার হীরো হয়ে উঠেছিলেন। খেলার শেষে সুইডিশ দলের ম্যানেজার উলফ লাইবার্গ আমেদকে বলেছিলেন, "গো টু ইয়োরোপ। যে-কোন বড় দল তোমাকে বরণ করে নেবে।" আমেদের খেলা দেখে আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম, ফুটবল খেলায় বল-কণ্ট্রোলই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এবং ওই গুণের মধ্যেই আছে খেলোয়াড়-জীবনে বড় হবার চাবি-কাঠি। পরে খেলতে-খেলতে সেটা আরও ভাল বুঝতে পেরেছি। যা-ই হোক, আমেদের সঙ্গে ওইভাবে হঠাৎ দেখা হওয়ায় ভোরের বাঙ্গালোর আমার কাছে বড় রঙিন মনে হল।

আমেদ খাঁ ছিলেন ফুটবলের জাত-শিল্পী। খেলতেন লেফট-ইনে। তখন দলের ছক ছিল ২+৩+৫। তিনজন হাফ ব্যাক ও পাঁচজন ফরোয়ার্ডের ছকে খেলেও প্রয়োজনমত আমেদ হয়ে পড়তেন চতুর্থ হাফব্যাক এবং ষষ্ঠ ফরোয়ার্ড। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে রবারের মত বাড়াতে এবং গুটিয়ে আনতে পারতেন। খেলা দেখতে-দেখতে মনে হত ফুটবল ওঁর ভাষা বোঝে। যেন মন্ত্রের গুণে চালিত হয়; যেমন শুনেছি, ধ্যানচাঁদের স্টিকে চালিত হত হকির বল। আমেদ খাঁর পায়ে শটও ছিল ভাল, কিন্তু গোলে শট করায় দ্বিধা ছিল। সারা দলকে খেলাতেন, নিজে চমকের পর চমক সৃষ্টি করতেন, আর যে-কোন খেলায় এমন দু-তিনটি বল তৈরি করে দিতেন, যে-বলে পা ছোঁয়ালেই গোল পাওয়া যায়। বল পাস করতেন যেন বলের গায়ে প্রাপকের ঠিকানা লিখে। আমার নিজের ধারণা, এখনকার খেলার যে ছক, এই ছকে আমেদ যদি লিঙ্কম্যান হিসাবে খেলতেন, আর খেলতেন বিদেশের কোন বড় দলে, তবে বিশ্ববরেণ্য ফুটবলার হতে পারতেন। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' বলে একটা কথা আছে। পৃথিবীর নামী-দামী বহু খেলোয়াড়কেই তো দেখেছি। এই কলকাতায় তোমরাও তো কসমস ক্লাবে বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়কে খেলতে দেখেছ। যদি আমেদ খাঁর খেলা দেখতে, তাহলে বুঝতে পারতে কী অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন তিনি।

আমেদ চিরদিন খেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দলে। তাই তাঁর পাশে আমি খেলার সুযোগ পাইনি। বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ জয়ের পর ১৯৫৫ সালের জাতীয় ফুটবলে যখন বাংলা দলে নির্বাচিত হলুম এবং আমেদকে পেলুম অধিনায়ক হিসেবে, তখন দুটি কারণে আমার খুশির অন্ত ছিল না। এক, মাত্র ১৭ বছর বয়সে জাতীয় ফুটবলে অংশ নেওয়া। দুই, আমেদ খাঁর পাশে খেলার সুযোগ পাওয়া, যদিও তাঁর গরিমার স্রোতে তখন একটু ভাটার টান।

সেবার জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল এর্নাকুলামে। আমার চিরদিনের অভ্যাস, কোন জায়গায় যেতে হলে মানচিত্রে সেই জায়গাটা দেখে নিয়ে তার আশপাশের শহর সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করে নেওয়া, সে ভারতের কোন জায়গাই হোক কিংবা বিদেশের কোন শহরই হোক। এর্নাকুলাম যাত্রার দিন দুই আগে ছোট একটা ম্যাপে চোখ রেখে এর্নাকুলাম খুঁজছি আর গুনগুন

চুনী পুরস্কার নিচ্ছেন (এর্নাকুলাম, ১৯৫৫)

করে বলছি—এর্নাকুলাম-কেরালা, এর্নাকুলাম-কেরালা। বাবা আমার যাবার অনুমতি আগেই দিয়েছিলেন। তিনি হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, ম্যাপে আমি এর্নাকুলামকে খুঁজছি। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "চুনী, বল তো 'টুইন সিটি' কাকে বলে ? আমাদের দেশে নাম করার মত টুইন সিটিই বা কোনগুলি ?" আমি আন্দাজ করতে পারলুম না, কেন বাবা এ প্রশ্ন করলেন। উত্তরও দিতে পারলুম না। ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। একটু হেসে বাবা বললেন, "ওই ছোট ম্যাপে তুই এর্নাকুলাম খুঁজে পাবি না। ওতে পাবি কোচিন হারবার। কোচিন আর এর্নাকুলাম হচ্ছে টুইন সিটি, যেমন আমাদের হাওড়া-কলকাতা, দক্ষিণের সেকেন্দ্রাবাদ-হায়দরাবাদ, ভারতের বাইরে কৌলুন-হংকং।" যমজ শহর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না বলে একটু লজ্জা হল। আবার কিছুটা মজাও লাগল নতুন একটা জ্ঞান আহরণ করে।

এর্নাকুলামের জাতীয় ফুটবলে আমাদের বাংলা দলে কারা ছিল দ্যাখো। আমেদ খাঁ—অধিনায়ক, পি বড়ুয়া—সহ অধিনায়ক, এম ঘটক, সুশীল গুহ, এ টি রহমান, তাপস সোম, পম্প মিত্র, পি বসু, সুভাষ সর্বাধিকারী, নিখিল নন্দী, প্রদীপ ব্যানার্জি, সুশান্ত ঘোষ, কানাইয়ান, কিট্টু, চুনী গোস্বামী, সত্তার ও নীলেশ সরকার। কোচ ছিলেন টি সোম।

সন্দেহ নেই, রীতিমত শক্তিশালী দল। আমার মত প্রদীপ ব্যানার্জিও এই বছর বাংলাদলের পক্ষে প্রথম জাতীয় ফুটবলে খেলেন। রহমানেরও প্রথম প্রতিনিধিত্ব। রহমান তো কেরলেরই ছেলে। টি সোম কোচ হলেও রহমান ছিল আমাদের গাইডের মত।

টি সোমের কথায় একটা গল্প মনে পড়ে গেল। অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় টি সোম চিরদিন ফুটবল খেলা, ফুটবল সংগঠন এবং ফুটবল প্রশিক্ষণের মধ্যে ডুবে আছেন। খেলার জগতে যেমন বাঘাদা নামে পরিচিত, তেমন প্রশিক্ষক হিসাবে দ্রোণাচার্য' নামে পরিচিত খেলোয়াড়-মহলে। এখন চুলগুলিও দ্রোণাচার্যের মত একেবারে সাদা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু যাত্রা থিয়েটারে দ্রোণাচার্যকে দেখেই একথা লিখছি। দ্বাপর যুগের দ্রোণাচার্যের চুল কালো ছিল কিনা কে জানে ! বাঘাদা বলাইদারই সমসাময়িক খেলোয়াড় হিসাবে নাম কিনেছিলেন এবং বলাইদার মতই পরে ফুটবল প্রশিক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে দুজনের মধ্যে গরমিল ছিল। বলাইদার খাওয়া-দাওয়ায় কোন পছন্দ-অপছন্দ ছিল না। যা পেতেন তা-ই খেতেন এবং দলের খেলোয়াড়দেরও তা-ই খাওয়াতেন। কিন্তু বাঘাদা বেশ ভোজনরসিক। ভাল-ভাল জিনিস নিজে খেতে এবং অপরকে খাওয়াতে ভালবাসেন। রন্ধনশিল্পেও পটু।

রহমানের কাছেই জানা গেল যে, এর্নাকুলামে বা সারা কেরলে সর্ষের তেলের ব্যবহার নেই। শুনে বাঘাদা প্রথমটায় মুষড়ে পড়লেন। তারপর করলেন কী, বিরাট এক টিন ভরতি সর্ষের তেল নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলেন। বললেন, বাঙালীর কি সর্ষের তেল ছাড়া খাওয়া হয় ? এর্নাকুলামে যত্ন করে নিজেই রাঁধতেন। যত্ন করে আমাদের খাওয়াতেন।

জাতীয় ফুটবলের খেলা হত তখন নক-আউট নিয়মে। আমাদের প্রথম ম্যাচ ছিল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশ দল মোটেই শক্তিশালী ছিল না। সুতরাং আমাদের সন্দেহ ছিল না জয় সম্পর্কে। কিন্তু আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরছিল। যে-কোন প্রতিযোগিতায় আমার প্রথম খেলাতেই যেমন গোল করেছি, তেমনি এখানেও জাতীয় ফুটবলের প্রথম খেলায় গোল করতে পারব তো ? পেরেছিলুম। একটি নয়, দুটি গোল

OBM-8549 R/BN

করেছিলুম প্রথম ম্যাচে, এবং এমনভাবে দুটি গোল করেছিলুম যে, নিজের খেলায় নিজে খুশি হয়েছিলুম, দর্শকদেরও তারিফ আদায় করতে পেরেছিলুম। পি-কে ব্যানার্জিও চমৎকার একটি গোল করেছিলেন। আমরা জিতেছিলুম ৪—০ গোলে। শুধু গোলের জন্যই নয়, পি-কে ও আমার খেলার মধ্যে এমন একটা যোগাযোগ ও সুন্দর ছন্দ গড়ে উঠেছিল যে, দুজনেই বারবার বাহবা পাচ্ছিলুম। কিন্তু আমাদের তুলনায় কম বাহবা পায়নি পরাজিত পক্ষের একটি ছেলে। খর্বকায় ফুটফুটে ফর্সা ছেলেটি পি-কে ও আমার যোগাযোগ ভাঙার জন্য দারুণ চেষ্টা করছিল। একবার পি-কের দিকে একবার আমার দিকে বল কাড়তে ছুটে আসছিল। ছেলেটিকে তোমরা নিশ্চয় চিনবে—রামবাহাদুর। সেদিনই বুঝেছিলুম এই নেপালী ছেলেটি উত্তরপ্রদেশে পড়ে থাকবে না, কলকাতায় যাবেই। পরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলে রামবাহাদুর কত বড় ফুটবলার হয়েছে, সবাই জানে।

প্রথম ম্যাচ থেকেই কেরলের দর্শকদের কাছে আমরা ফেভারিট হয়ে উঠলুম, যেমন এ-বছর জাতীয় ফুটবলের সময় কলকাতার দর্শকরা হয়ে পড়েছিল কেরলের সাপোর্টার। বিশেষ করে আমাকে ও রহমানকে তারা আপন করে নিয়েছিল। রহমান তো তাদেরই ছেলে। খেলেছিলও ভাল। আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচ কিন্তু ছিল কেরলেরই সঙ্গে। সাপোর্টাররা পড়ল সমস্যায়। কেরল অবশ্য আমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে হেরে যায় এবং সেই সংগ্রামের মধ্যে একটি ছেলের খেলায় ফুটে ওঠে শান্ত শৌর্য। ভাগ্যদেবী বোধ হয় তারও ললাটে লিখে রেখেছিলেন যে, কলকাতার ফুটবল-মাঠই তার প্রতিষ্ঠার অঙ্গন। ছেলেটির নাম জেমস ফেন। পরের বছর জাতীয় ফুটবলেই তার গায়ে উঠেছিল বাংলার জার্সি। ব্যাকে ফেনের পজিশনাল প্লে ছিল দেখার মত। খেলত মাথার বুদ্ধি ও পায়ের পরিচ্ছন্ন কৌশলে। বহুদিন রাজস্থান ক্লাবে খেলেছে।

কেরলের বিরুদ্ধে জয়ের পর সারা এর্নাকুলাম শহর বাংলাকেই তাদের নিজের দল বলে ধরে নিল। বোধহয় রহমানের জন্যই। কিন্তু আমি কীভাবে তাদের চোখের মণি হয়ে উঠলুম তারাই জানে। রাস্তায় ঘোরার সময় দেখি অনেক স্টুডিওতে আমার ও রহমানের পাশাপাশি ছবি।

পরের ম্যাচ সেমিফাইনাল। সার্ভিসেস দলের সঙ্গে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জওয়ানদের দল। সারাক্ষণ সংগ্রামও করে চোয়াল শক্ত রেখে। তখন কিছু ভাল খেলোয়াড়ও ছিল সামরিক বাহিনীতে। যেমন—জোনস, পার্ল, ডোরাইলিঙ্গম, আলফানসো।

খেলার দিন ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। কানাইয়ান তখন রাইট আউটে খুব ভাল খেলত। গতি ছিল হরিণের মত ক্ষিপ্র। কিন্তু পি-কে রাইট আউটে আরও ভাল খেলছিলেন বলে বোধ হয় ধরে নিয়েছিল সে আর খেলায় চান্স পাবে না। সকালে চায়ের টেবিলে দেখি আমাদের একজন খেলোয়াড় কম। কানাইয়ান নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল—রব উঠল। বাঘাদা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কানাইয়ানের খোঁজ পেলেন না। পরে জানা গেল আগের রাত্রে সে তার বোনের জন্য একটা হারমোনিয়াম কিনেছিল। তাই নিয়ে চলে গেছে। কানাইয়ান আর ফিরে আসেনি। আগে লিখতে ভুলে গেছি, সত্তার দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত এর্নাকুলামে যাননি।

আমাদের সঙ্গে তিনদিন তীব্র সংগ্রাম করে সার্ভিসেস দল হেরে যায়। আমাদের অধিনায়ক আমেদ খাঁ সেমিফাইনালে দারুণ চোট পান ডোরাইলিঙ্গমের অন্যায় ফাউলে। ডোরাইলিঙ্গম ছিল একটু মারকুটে খেলোয়াড়। কিন্তু আমেদের আগের দিন থাকলে কি তার শিকার হতেন ? যে খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে সর্পিল গতি ও চমকপ্রদ বডি সোয়ার্ভে বহুজনের হিংস্র আক্রমণকে বানচাল করে দিয়েছেন সেই খেলোয়াড়কে রক্তাপ্লুত মুখে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে চকিতে একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে যায়।

টি সোম

আমেদ্

রাম বাহাদুর

কেম্পিয়া

অরুণ ঘোষ

রহমান

মনে হয়, শারীরিক পটুতা পুরোপুরি বজায় থাকতে থাকতেই বোধ হয় খেলা থেকে অবসর নেওয়া ভাল। আমার তখন বয়স কম। তবু কথাটা মনে হয়েছিল। পরে ঠিকও করে নিয়েছিলুম যে, খেলার শক্তি থাকতে থাকতেই খেলা থেকে সরে যাব।

ফাইনাল খেলা ছিল মহীশূরের সঙ্গে, এখন যে-রাজ্যের নাম কর্নাটক। আমাদের কাছে সেটা ছিল দারুণ চ্যালেঞ্জ। কারণ আগে দুবার সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে মহীশূর বাংলাকে হারিয়ে দিয়েছে। ১৯৪৬ সালে বাঙ্গালোরে এবং ১৯৫২ সালেও

সহজে ইংরেজি

সহজে ইংরেজি শেখার এই আসরে আমরা ধরে নেব সবাই সারাক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলছে। কেন বলছে, জানি না।

চামেলির সকাল

সাত বছরের ছোট্ট মিলি অর্থাৎ চামেলির ঘুম ভাঙতেই দেখে, তার আদরের বেড়াল আরাবল্লি তার পাশটিতে এসে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে। তখন তাদের মধ্যে এই রকম কথাবার্তা হল ঃ

Milly : Get off, you naughty thing Go away !

Ara : Pr-r-r-r.

Milly : Please, Ara, let me get up.

Ara . Pr-r-r-r-r-r.

Milly : Why don't you understand, Ara ? I've got to go to school.

Ara : Miaow.

এই কথোপকথনের মধ্যে আরাবল্লির কথাগুলো আমরা ভাল বুঝতে পারিনি (মিলি হয়তো পারে)। মিলি কী বলল লক্ষ করা যাক।

প্রথমেই মিলির (১) নম্বর কথা, রাগের স্বরে হুকুম। তারপর (২) নম্বর, অনুরোধ। তারপর (৩) নম্বর, প্রশ্ন। সবশেষে, (৪) নম্বর, সেটা শুধু কিছু বলা জানানো।

শুধু একটি কি দুটি মাত্র শব্দ দিয়েই হুকুম করা চলে। হুকুম করা মানে কিছু করতে বলা, কিংবা করতে মানা করা।

Go ! Come ! Sit ! Stay ! Run ! Don't laugh ! Don't look !

অনুরোধ করতে গেলে এর সঙ্গে অনুরোধসূচক শব্দটি জুড়ে দিতে হয় ঃ

Please don't cry. Please stay. Please, Ara, let me go.

ইংরেজিতে ওই অনুরোধসূচক কথাটি সব সময়ে কেন লাগাতে হয় জানো ? না হলে, কাউকে কিছু করতে বললে সেটা হুকুমের মত হয়ে যায়। সেটা খুবই অভদ্রতা। অবশ্য অনুরোধ অন্যভাবেও জানানো হয় ঃ

Will you sit down ?

Won't you sit down ?

Come in the morning, will you ?

Let me carry your bag, won't you ?

ওপরের কথাগুলো প্রশ্নের মত দেখালেও, আসলে ওগুলো অনুরোধ।

ইংরেজদের কথায় আদেশ খুবই কম, অনুরোধের ছড়াছড়ি। তাই চামেলি বেড়ালকেও বলছে ঃ

Please, Ara, let me get up.

আবার ইশকুল যাবার আগে মায়ের সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হল তাতেও দেখ কত অনুরোধ।

Mother : Drink up your milk, will you ? Your bus will be here any minute.

Milly : Please, Mummy, let me play with Ara just a little. She will be nice and not spoil my dress. Won't you be nice, Ara ?

প্রসাদ

বাঙ্গালোরে। তা ছাড়া, বাংলা তখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত থেকে একবারও সন্তোষ ট্রফি জয় করে আনতে পারেনি। আমরা কিন্তু সফল হলুম। শুধু সন্তোষ ট্রফি নিয়েই ফিরিনি, পরে ওদের কাছ থেকে বাংলায় ছিনিয়ে এনেছিলুম ওই ফাইনালে ওদের শ্রেষ্ঠ হাফ-ব্যাক কেম্পিয়াকে। পরের বছর ত্রিবান্দ্রমে জাতীয় ফুটবলের সময় জেমস ফেনের সঙ্গে কেম্পিয়াও খেলেছিল বাংলার জার্সি গায়ে চাপিয়ে। পরে আমার সঙ্গেই মোহনবাগানে খেলেছে। প্রচুর সুনাম কিনেছে।

ফাইনালে মহীশূরের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন পি-কে। বাঘাদা বলেছিলেন, এ জেম অব এ গোল—এ জেম অব এ পাস। মহীশূরের দুজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে আমি চলে গিয়েছিলুম গোলের দুরূহ কোণে, একেবারে জীরো অ্যাঙ্গেলে। সেখান থেকে শট করলে হয়তো গোল হত না। কিংবা গোলকিপার আটকে দিত। তাই বল মাইনাস করেছিলুম মাটি ঘেঁষে। পি-কে আগে থেকে আক্রমণের গতির সঙ্গে উপরে উঠে আসছিলেন। পায়ের সামনে বল পেয়েই মাটি ঘেঁষা এক তীব্র শট এবং গোল। একটা দারুণ সোরগোল উঠেছিল মাঠে।

ক'দিন ধরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মালুম হচ্ছিল আমার প্রতি—বাবার কথাতেই বলি—যমজ শহরের ভালবাসার মিটার ক্রমেই উপরে উঠছে। কিন্তু সেটা যে কত উপরে উঠেছিল তার প্রমাণ মিলল পুরস্কার বিতরণের সময়। বেস্ট প্লেয়ার অব দি ফাইনাল এবং বেস্ট প্লেয়ার অব দি টুর্নামেন্টের পুরস্কার ছাড়াও কী পেয়েছিলাম জানো ? সোনারূপোর বিস্তর মেডেল, মেডেল সেট করা রূপোর চামচ, পার্কার, শেফার্স, এভারশার্প পেন, পেন সেট, টি সেট, কফি সেট, কিটস ব্যাগ—সব মিলিয়ে শখানেক প্রাইজ। সোনার মেডেলই ছিল দশটি। একটি ছিল ভরি আড়াই ওজনের প্রাচীন কালের স্বর্ণমুদ্রা। তার ওপর যে ভাষার ছাপ আছে আমরা তার অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। মনে হয় যেন ও লেখা রয়েছে। বাড়ি ফেরার পর সেটা মাকে দিই।

কলকাতাকে ফুটবল-শহর বলা হয়। কিন্তু ফুটবল-রাজ্য বলে যদি কোন রাজ্যকে চিহ্নিত করতে হয় তবে কেরলকেই করা উচিত। কেরল ছোট রাজ্য, কিন্তু ফুটবল নিয়ে কী উৎসাহ উদ্দীপনা, কত মাতামাতি। এর্নাকুলাম, কোজিকোড, ত্রিবান্দ্রম, কুইলন শহরগুলি সবই পঞ্চাশ-একশো মাইল দূরত্বের মধ্যে। সব শহরেই জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছে। যখন যে শহরে গেছি, দেখেছি, ফুটবলের টানে সব শহরের মানুষ এক শহরে এসে মিশেছে। কোনদিন স্টেডিয়ামের একটুখানি জায়গাও ফাঁকা দেখিনি।

কেরলের মানুষ যে আমাকে ভোলেনি, দীর্ঘ কুড়ি বছর পরেও মনে রেখেছে, তার প্রমাণ পেলুম ১৯৭৫-এ কোজিকোডে জাতীয় ফুটবল খেলার সময় ও খেলার পরে। আমি গিয়েছিলুম জাতীয় দলের নির্বাচক হিসাবে। বাংলা দল সেবারও সন্তোষ ট্রফি পেল, ফাইনালে কর্নাটককে হারিয়ে। খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণের পর আমাকেও সুন্দর একটি ট্রানজিস্টার রেডিও উপহার দেওয়া হল। আমি তো খেলোয়াড় ছিলুম না। বাংলা দলের কর্মকর্তা হয়েও যাইনি। একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলুম, "আমাকে পুরস্কার কেন ?" চটপট উত্তর পেলুম, "নজরানাও বলতে পারো, সম্মান-পুরস্কারও বলতে পারো। আসলে ওটা ভালবাসার উপহার।"

রাস্তা দিয়ে চলার সময় দেখলুম একটি স্টুডিওতে এখনো আমার ও রহমানের ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জার্সি গায়ে খেলার ছবি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, ছবিটা যেন আমার দিকে চেয়ে বলছে, আর কি কুড়ি বছর আগের এই দিন ফিরে পাবি ?

(ক্রমশ)

উপন্যাস

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা একটা ভূতুড়ে ছবি দেখতে সিনেমায় গিয়েছিল। ছবি দেখতে বসে সে এক অদ্ভুত মানুষকে দেখল, যে খুশি-মতন মরে যায়, আবার বেঁচে ওঠে। ভয় পেয়েছিল বরদা খুবই। পরে লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল অবশ্য। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর। ওঁর কাজ হল মানুষ নিয়ে গবেষণা। সাধারণ মানুষ নয়, এমন সব মানুষ, যাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অলৌকিক কোনো গুণ রয়েছে। দুমকার কাছে সেই গবেষণা-কেন্দ্র।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে নিয়ে এলেন দুমকার সেই রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে মহাদেব বলে একটা লোক জুটেছিল যার সঙ্গে বরদার চেহারায় খুব মিল। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে বিশ্বাস করতেন না। মহাদেবকে তিনি শয়তান বলে মনে করতেন। মহাদেবের উদ্দেশ্য ছিল এই রিসার্চ সেন্টার থেকে দু-চার জনকে বাইরে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকাপয়সা কামানো, মানুষকে ঠকানো। সিদ্ধেশ্বর মহাদেবকে জব্দ করতে চাইছিলেন। কিন্তু বরদাকে আনার পর নিজেই জব্দ হয়ে গেলেন। তাঁর প্রায় চোখের সামনেই এক টাঙাওয়ালা খুন হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর সন্দেহ করলেন, সুজন বলে একটা লোক, যার গায়ে অসুরের মতন ক্ষমতা, সে মহাদেবের প্ররোচনায় খুন করেছে টাঙাওয়ালাকে। সন্দেহ করলেন বটে কিন্তু সুজন কোথায়?

১০

সিদ্ধেশ্বর না ফেরা পর্যন্ত বরদা ভয় আর উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করল। শান্তভাবে সে বসতে পারছিল না। একবার করে বাইরে যাচ্ছিল, এগিয়ে গিয়ে দেখছিল সিদ্ধেশ্বরের ঘরে বাতি জ্বলছে কি না। আবার নিজের ঘরে ফিরে আসছিল।

সে ভিতু মানুষ, অকারণ কোনো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেও তার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু আজ মহাদেব মানুষটাকে তার এতই খারাপ লেগেছে যে, বরদার রাগ হচ্ছিল ভীষণ। ঘৃণাও। লোকটা বদমাশ নয় শুধু, নৃশংস। কত তুচ্ছ কারণে সে টাঙাঅলাকে খুন করাল। বরদার বাস্তবিকই খানিকটা সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন। এখন আর তার কোনো সন্দেহ নেই, মহাদেব নিজের মুখে স্বীকার করেছে, টাঙাঅলার মৃত্যুতে তার হাত রয়েছে, সুজনকে দিয়ে খুন করিয়েছে টাঙাঅলাকে। কিন্তু কী দরকার ছিল নিরীহ টাঙাঅলাকে খুন করার? বরদাকে ভয় দেখানোর জন্যে মিছিমিছি একটা মানুষ খুন! লোকটা জন্তু না পিশাচ?

সিদ্ধেশ্বর ফিরলেন আরও খানিকটা পরে।

বরদা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সিদ্ধেশ্বরের ঘরের দিকে ছুটল।

ঘরে ঢুকে সিদ্ধেশ্বর সবে বসেছেন, বরদা এসে দাঁড়াল।

"আপনি মশাই আমায় বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন," বরদা বলল, "আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।"

"কেন?"

"শুনলাম আপনি সুজনের খোঁজ করতে বেরিয়েছেন সাইকেলে চড়ে, একা-একা?"

ঘরে জল ছিল খাবার। সিদ্ধেশ্বর নিজেই জল গড়িয়ে নিয়ে খেলেন। বললেন, "বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

বরদা বসল।

সিদ্ধেশ্বরকে সামান্য ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললেন, "আপনাকে কে বলল আমি সুজনের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম?"

"মহাদেব।"

"মহাদেব?"

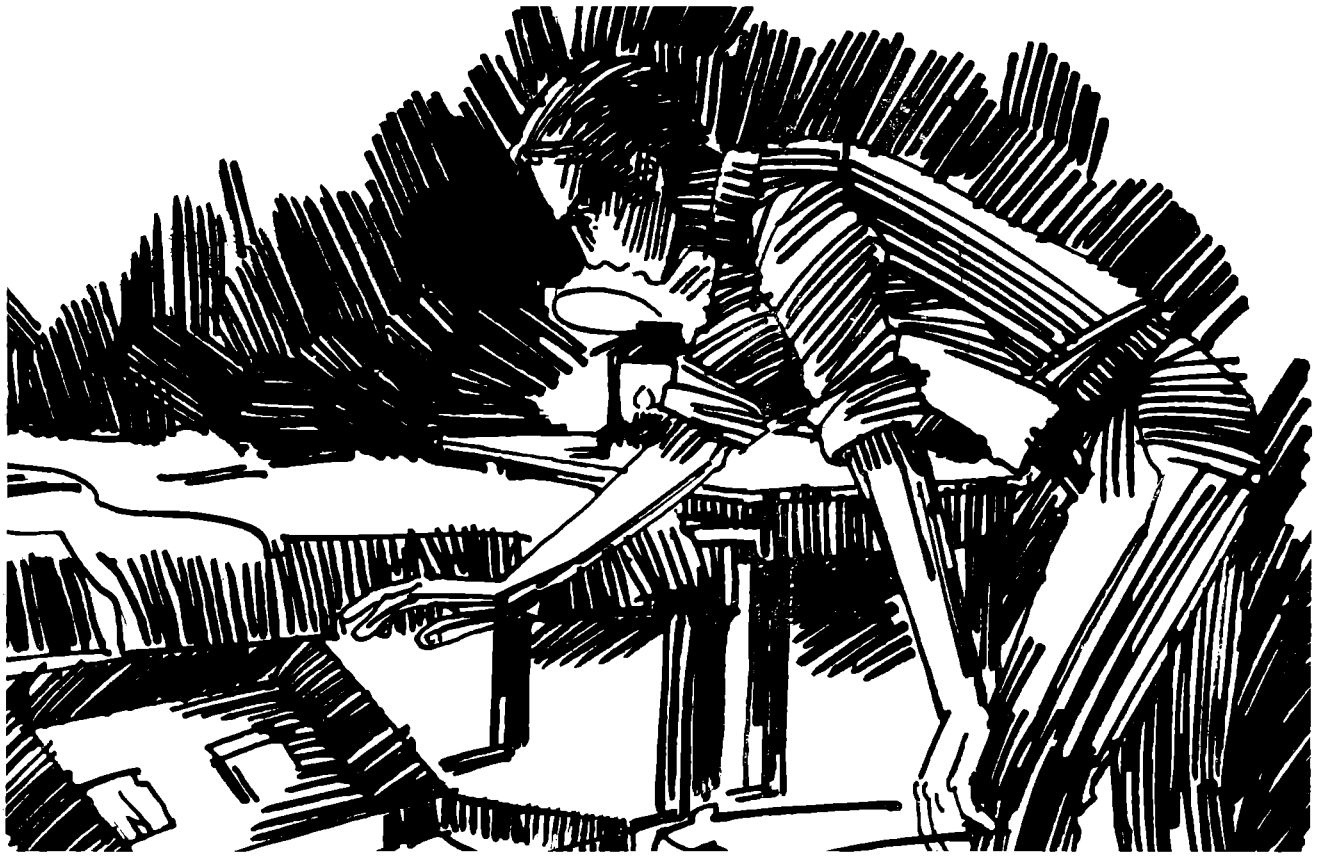

বরদা মহাদেবের কথা বলল, লোকটা বরদার ঘরে ঢুকে কেমন করে শাসিয়ে গেছে, তার বিবরণ দিল। "আমায় বলল কী জানেন?" সুজনকে খুঁজতে গিয়ে আপনিই না টাঙাঅলা হয়ে যান!"

সিদ্ধেশ্বর শুনছিলেন সব। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমি তো বেচারা টাঙাঅলা নই। তা ছাড়া আমি জেনেশুনেই গিয়েছি। মহাদেব কেমন করে ভাবল আমি হাত খালি করে সুজনকে খুঁজতে যাব!" বলে সিদ্ধেশ্বর জামা তুলে কোমরের কাছে একটা চামড়ার বেল্ট-মতন দেখালেন। একপাশে ছোরার খাপ, সরু লম্বা মতন, মামুলি ছোরাছুরি নিশ্চয় নয়। সরু লম্বা ছোরা বোধ হয়।

বরদা অবাক গলায় বলল, "আপনি এসবও জানেন?"

জামাটা কোমরের ওপর আবার ফেলে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। "জানি। যাদের সঙ্গে ঘর করি, তারা তো সাদামাটা মানুষ নয়। যাকগে ও-কথা। মহাদেব আপনাকে শাসিয়ে গেল তা হলে?"

"দুদিন সময় দিয়েছে কলকাতা ফিরে যাবার জন্যে।"

সিদ্ধেশ্বর যেন ভাবছিলেন। চোখের পাতা বুজে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, "মহাদেব নিজেকে যতটা ধূর্ত মনে করে ততটা নয়। তাছাড়া ও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটার-পর-একটা ভুল করে যাচ্ছে।"

"ভুল?"

"টাঙাঅলাকে কেন মারতে গেল! টাঙাঅলা না মরলে সুজনের কথা আমি জানতে পারতাম না। তারপর ও যখন বুঝল, ধরা পড়ে গিয়েছে, আপনাকে শাসাতে এল। মহাদেব ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলে এখন আর সামলাতে পারছে না। বোকার মতন কাজ করছে। এখন ও ভুল করবে। মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।"

বরদা বলল, "আপনি এবার তা হলে ওকে ধরুন।"

সিদ্ধেশ্বর কোনো জবাব দিলেন না। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছিল। শিস উঠছে একপাশে। বাতিটা কমিয়ে দিলেন। সিদ্ধেশ্বরের ঘর সাধাসিধে, খাট আছে, দেরাজ আছে একটা, টেবিল আর চেয়ার। সামান্য কটা বই।

বরদা বলল, "মহাদেবকে আর আপনি এগুতে দেবেন না। আবার কাকে মেরে বসবে!"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধরার আগে সুজনকে ধরতে চাই।"

"তার কোনো খোঁজ পাননি?"

"পেয়েছি। কিন্তু ধরতে পারিনি। ও কাছেই গনুডিয়া বলে একটা গাঁয়ে ছিল, সেখানে আট-দশ ঘর কাঠুরিয়া থাকে। ওই গাঁ ছেড়ে ও অন্য কোনো জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। কোথায়, তা কেউ বলতে পারল না। আমি তিন-চারটে গাঁ ঘুরে এলাম। সুজনকে দেখেছে সকলেই—অথচ বলতে পারছে না সে কোথায় রয়েছে।"

বরদা তেমন একটা অবাক হল না। এই ফাঁকা, বসতিহীন জায়গা, দু-একটা ছোট ছোট দেহাতি গ্রাম, এখানে ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা এমন কী কঠিন। আবার এই জায়গা এমন যে, একবার কাউকে চোখে দেখলে তার পক্ষে গা-আড়াল দিয়ে বেশিদিন থাকাও মুশকিল। ভিড়ে মিলিয়ে যাবার সুযোগ নেই।

"সুজন কি পালিয়ে গেছে?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"মনে হয় না পালিয়েছে।"

"কেন?"

"মহাদেব কি তাকে ছেড়ে দেবে?"

"মহাদেবের সঙ্গে ওর এত খাতিরই বা কিসের?"

যারা কচি কাঁচা তাদের ত্বকের

নিরাপত্তার জন্য চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

ছোটদের নিয়ে মেলাই ঝক্কি ঝামেলা। আর এক দুর্ভাবনা তাদের কোমল ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষা। জীবাণু সংক্রমণের ভয় তাদের ক্ষেত্রেই বেশি। মায়েদের সব ভাবনা থেকে ছুটি দিল বোরোলীন। কাটা ছেঁড়া ফাটায় অনবদ্য। রুক্ষ, শুষ্ক কিংবা ঝলসানো ত্বকেও অদ্ভুত কাজ করে

বোরোলীন

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড • বোরোলীন হাউস • কলিকাতা-৭০০ ০০৩

সিদ্ধেশ্বর ম্লান হাসলেন। বললেন, "শয়তানের সঙ্গে শয়তানেরই খাতির হয়।...তবে সুজন বোকা, নির্বোধ। ওর ওই পাশবিক শক্তি ছাড়া কিছু নেই। তাও খানিকটা ভৌতিক। মহাদেব ওকে কিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাত করেছে।"

বরদা বলল, "কিন্তু লোকটার ভয় থাকতে পারে। মানুষ মারার পর সে যদি বুঝে থাকে—ধরা পড়লে পুলিসের হাতে পড়তে হবে, তাহলে তো পালাতেও পারে।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "সুজনের সেটুকু বুদ্ধিও নেই। ও হল জন্তু। বুদ্ধি বলে কিছু থাকলে মহাদেবের পাল্লায় পড়ে! না, অকারণ একটা মানুষকে ওইভাবে মারে?"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

বাইরে এসে বরদা চারপাশে তাকাল একবার। শান্ত। ঠিক যেন কোনো আশ্রম; কোনো-কোনো ঘরে আলো জ্বলছে, কোনোটা অন্ধকার; সাড়াশব্দও তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, গাছ পাতার মাথায়-গায়ে চাঁদের আলো। শীত-শীত করছে। এমন শান্ত নির্জন জায়গায় কেমন করে এই খুনোখুনি, শয়তানি এসে ঢুকল! আশ্চর্য!

বরদাকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার সন্দেহ, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। সুজন ছাড়াও তার দলে লোক আছে।"

বরদা বলল, "কেমন করে বুঝলেন?"

"না বুঝলে আর বলছি কেন! সুজনের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে কে? আছে কেউ। আমার বিশ্বাস, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। তার মতলব ছিল, জনা তিন-চার লোক নিয়ে সে যদি চলে যেতে পারে, বাইরে গিয়ে একটা ভেলকিবাজির ব্যবসা ফাঁদবে। টাকা-পয়সা কামাবে। দেখতে-দেখতে বড়লোক হয়ে উঠবে।"

বরদা বলল, "অত সোজা?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সোজা বলেই তো বলছি। মানুষ রহস্য জিনিসটা ভালবাসে, পছন্দ করে। এটা শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সর্বত্রই। আমাদের এখানে আরও বেশি। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস, অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখার জন্যে ধরনা দেওয়া আমাদের স্বভাব। এ-দেশে ভগবানের চেয়ে ভগবানের চেলাদের প্রতিপত্তি বেশি। তাই না?"

বরদা অস্বীকার করতে পারল না। এই রকমই তো হয়, কে কোথায় তামার মাদুলি হাতে নিয়ে সোনা করে দিয়েছে, কে এক পুরিয়া ছাই খাইয়ে মরমর রোগীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এ-সব শোনা মাত্র মানুষ ছোটে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মহাদেব ভেতরে-ভেতরে এই মতলবই এঁটেছিল। সে এখান থেকে দু-তিন জনকে হাত করে নিয়ে যাবে, তারপর বাইরে গিয়ে পয়সা-কড়ি লুঠবে।" বলে একটু থামলেন তিনি; আবার বললেন, "আমরা এখানে যাদের এনেছি, তাদের দেখিয়ে পয়সা করতে তো চাই না, আমরা চাই মানুষের—কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে যে অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য শক্তি আছে—তার একটা ব্যাখ্যা বার করতে। আমাদের উদ্দেশ্য আলাদা। মহাদেবের অন্য মতলব।"

বরদা বলল, "সুজন ছাড়া আর কাকে-কাকে মহাদেব হাত করেছে?"

সিদ্ধেশ্বর হাঁটতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে। কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, "সেটা খুঁজে বার করতে হবে। তবু আমার ধারণা, গোপীমোহনকে সে দলে টানতে পারে।"

"গোপীমোহন! যাকে বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ-পনেরো মিনিট শুইয়ে রেখে তুলে নেবার পর দেখতে-দেখতে আবার

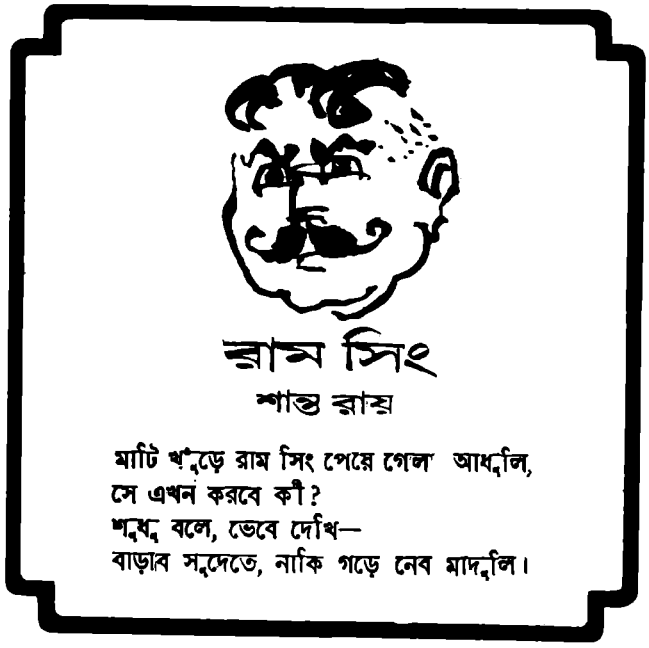

গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে?"

"হ্যাঁ, তাকেও টানতে পারে।"

"কেন?"

সিদ্ধেশ্বর একবার বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "গোপী একসময় খেলা দেখাত, বলেছি না আপনাকে? ছোট-ছোট সার্কাস পার্টির লোক তাকে ভাড়া করে নিয়ে মেলায়-মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত। গোপীকে খেলা দেখানোর কাজে ব্যবহার করা খুব সোজা। কাজও দেবে। মহাদেব তার ভক্তদের বোঝাতে পারবে সে একটা মানুষকে কেমন আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে পারে। স্বয়ং ভগবান সে।"

বরদা বলল, "সীতারামকেও কি হাত করেছে মহাদেব?"

"না। সীতারামকে দিয়ে ওর সুবিধে হবে না। সীতারাম, অর্জুন, বংশী মাঝি, গদাধর, এদের মহাদেব নিতে পারবে না। ওরা নির্লোভ। তা ছাড়া মহাদেবের ফাঁদে তারা পা দেবে বলে মনে হয় না।"

"তা হলে আর কে থাকল?"

"আছে। আপনি তাকে দেখেছেন হয়ত, কিন্তু পরিচয় জানেন না।"

"কে?" বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

"চাঁদু। ভাল নাম শীতল।...দেখেননি তাকে? মাথায় বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, কপালের কাছে কাটা দাগ, টেরা চোখ...। সাইকেল নিয়ে হরদম ছোটাছুটি করে।"

বরদার মনে পড়ল। বলল, "দেখেছি।"

"চাঁদুকে আমরা অর্জুনদের দলে ফেলি না। তার অত উঁচু দরের ক্ষমতা নেই।"

বরদা তার ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। বাতি জ্বলছে ঘরে, দেখা যাচ্ছে না। জানলা দরজা বন্ধ।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চাঁদু যে-কোনো মানুষের গলা বার কয়েক শোনার পর নকল করতে পারে। এত ভাল নকল করতে পারে যে, আসল আর নকল ধরা যায় না। তাছাড়া তার অন্য গুণ হল সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী। এখানে তার অনেক কাজ। আমরা তাকে কাজের জন্যে রেখেছি, অন্য কোনো কারণে নয়।"

বরদা চাঁদুর ব্যাপারটা ভাল বুঝল না। বলল, "চাঁদুকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে মহাদেবের কিসের লাভ হবে?"

"তা হবে।...আপনি এখন বুঝতে পারছেন না। যে মানুষ

উপস্থিত নেই, যদি আড়াল থেকে তার গলা আপনি শুনতে পান, আপনার কি মনে হয় না লোকটা আশেপাশে কোথাও রয়েছে?" সিদ্ধেশ্বর একবার আকাশের দিকে মুখ তুললেন, আবার নামালেন। "সহজ একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি রাত্তিরে ঘুমোচ্ছেন, বাইরে থেকে আমার গলা করে চাঁদু ডাকল। আপনি নিশ্চয় ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবেন। তারপর দেখবেন, সুজন ঘরে ঢুকছে—চাঁদু আড়ালে সরে গেছে।"

বরদা কথাটা বুঝতে পারল। ভয়ও পেল। বলল, "বলেন কী! মহাদেব আমার ঘরে ওইভাবে সুজনকে ঢুকিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন। "না, তা বোধ হয় করবে না মহাদেব। তবে চাঁদুকে হাতে পেলে মহাদেবের 'টিম'টা এখনকার মতন ভাল হবে। যে-কোনো জায়গায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারে, বুজরুকি করে, লোককে ধাঁধা খাইয়ে বড়লোক হয়ে যেতে পারে দুদিনে।"

বরদা দরজায় হাত রাখল, "আসবেন?"

"না, আর যাব না। রাত হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার খাবার এসে হয়ত ফেরত চলে গেছে। খবর দিয়ে দিচ্ছি। আমার অন্য একটা কাজ আছে।"

"কী কাজ?"

"পরে শুনবেন।...আমারও চোখ আছে সবদিকে। মহাদেব আজ বিকেল থেকে কী কী করেছে, কোথায় গেছে, কার সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়েছে তার খোঁজ নেব।"

বরদা বলল, "আপনি কি এখানে স্পাই রেখে দিয়েছেন?"

"এখন রাখছি। না রাখলে মহাদেব কখন যে কী করে বসবে, বুঝতে পারব না। ভুল একবার হয়েছে, দ্বিতীয় বার যেন না হয়।"

বরদা বলল, "আজ মহাদেব যে আমার ঘরে এসেছিল, এটা আমি না-বললেও আপনি তা হলে জানতে পারতেন?"

"পারতাম। তবে আপনাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, তা জানতে পারতাম না।"

বরদা বোকার মতন হাসল।

দরজার ছিটকিনি তোলা ছিল। সাধারণ একটা তালাও দিয়ে গিয়েছিল বরদা। তালা খুলল।

"আমার ওপর যে মাত্র দু-তিন দিনের নোটিশ আছে মশাই," বরদা বলল, "মহাদেব আমায় টাঙাঅলা করে ছেড়ে দেবে বলেছে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেব নিজের ফাঁদে পা দিয়েছে, তার কী অবস্থা হয় দেখুন! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর সাধ্য নেই—আপনার কিছু করে।"

বরদা নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না।

হঠাৎ বরদার কেমন যেন সন্দেহ হল। বাতির আলো এত কম কেন? বিছানার দিকে তাকাল। কিছু নেই। আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। ঘাড় পিঠ নুইয়ে খাটের তলা দেখল। দেখেই মনে হল, খাটের তলায় রাখা তার সুটকেসটা খোলা।

বরদা থতমত খেয়ে গেল। তার ঘরে কেউ ঢুকেছিল। কে এসেছিল আবার? মহাদেব, না অন্য কেউ?

কেন এসেছিল? সিদ্ধেশ্বরকে কি ডাকবে আবার?

বরদা বাইরে বেরিয়ে এল। সিদ্ধেশ্বর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর ডাকল না তাঁকে। কিন্তু ভীত হয়ে পড়ল।

(ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে

এক মাত্র নিম

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের
যাবতীয় ভেষজ ও ঔষধীয় গুণ

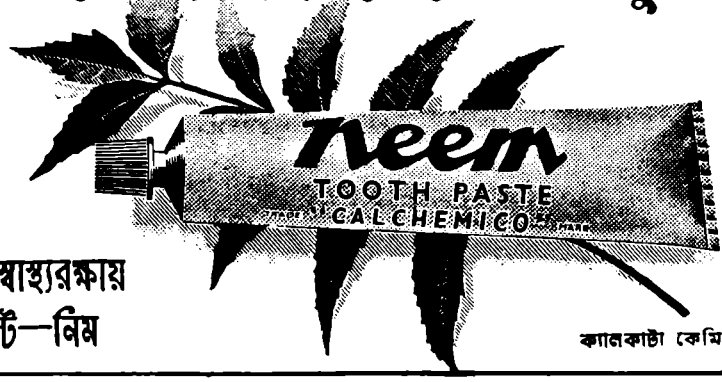

IDL/NTN/48

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর তৈরি

গোয়েন্দা বাজ

মিঃ হল্, তক্তাগুলো পালটে নিন, নয়তো আপনার গাড়ি শেষে খানায় পড়ে যাবে।
অ্যাদ্দিন তো পড়েনি!
ডনি ডাণ্ডি অন্যদের উপকার করতে চায়।
পরদিন...
আরে, তাই তো!
ডনি যা বলেছিল, ঠিক তা-ই হল!
এর মধ্যে নিশ্চয়ই ডনির কারসাজি আছে, বাবা!
আমরা, ঢিল ছুঁড়েছিলুম, ও তার শোধ নিল।
12-3
ঝড় আসছে, মিঃ ব্যানার। এখন এইভাবে আগুন না-জ্বালানোই ভাল।
নিজের চরকায় তেল দাও হে ছোকরা।
আধ ঘণ্টা বাদে...
মার্থা! জুনি! সর্বনাশ হয়ে গেল!
কিন্তু ছেলেটা জানল কী করে যে, ঝড় উঠবে?
ভুতুড়ে ব্যাপার! ছেলেটা সুবিধের নয় হে!
12-4
গাঁয়ে এসে টাটকা মাংস পেলুম ; তার জন্যে ধন্যবাদ, জন।
দাঁড়াও, ডনি ডাণ্ডি বলে একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি!
গোয়েন্দা বাজ সয়ার তাঁর বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন...
ডনি, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিঃ সয়ার, আর ইনি মিসেস সয়ার।
ওয়াশিংটন থেকে আসছেন তো?
কী করে বুঝলে?
কী জানি। এমনিই মনে হল।
ছেলেটার এই একটা অদ্ভুত ক্ষমতা। তা ছাড়া কোনো কিছু ঘটবার আগেই ও টের পায়।
12-6
মিঃ বুন, আপনার জন্যে একটু মধু এনেছি।
তাই বুঝি? আর মধু আছে? থাকলে মিসেস সয়ারও কিনতে পারেন হয়তো।
নিশ্চয়ই কিনব।
ক্রিস্টি, তুমি বরং এটাই নাও। আমি পরে ডনির কাছ থেকে আর-কিছুটা কিনে নেব।
12-7
কিংবা তোমরা যদি গাড়িতে করে ডনির বাড়িতে চলে যাও তো সেখানেই কিনে নিতে পারবে।
বেশ তো।
এসো, ডনি।

(ক্রমশ)

তোমাদের পাতা

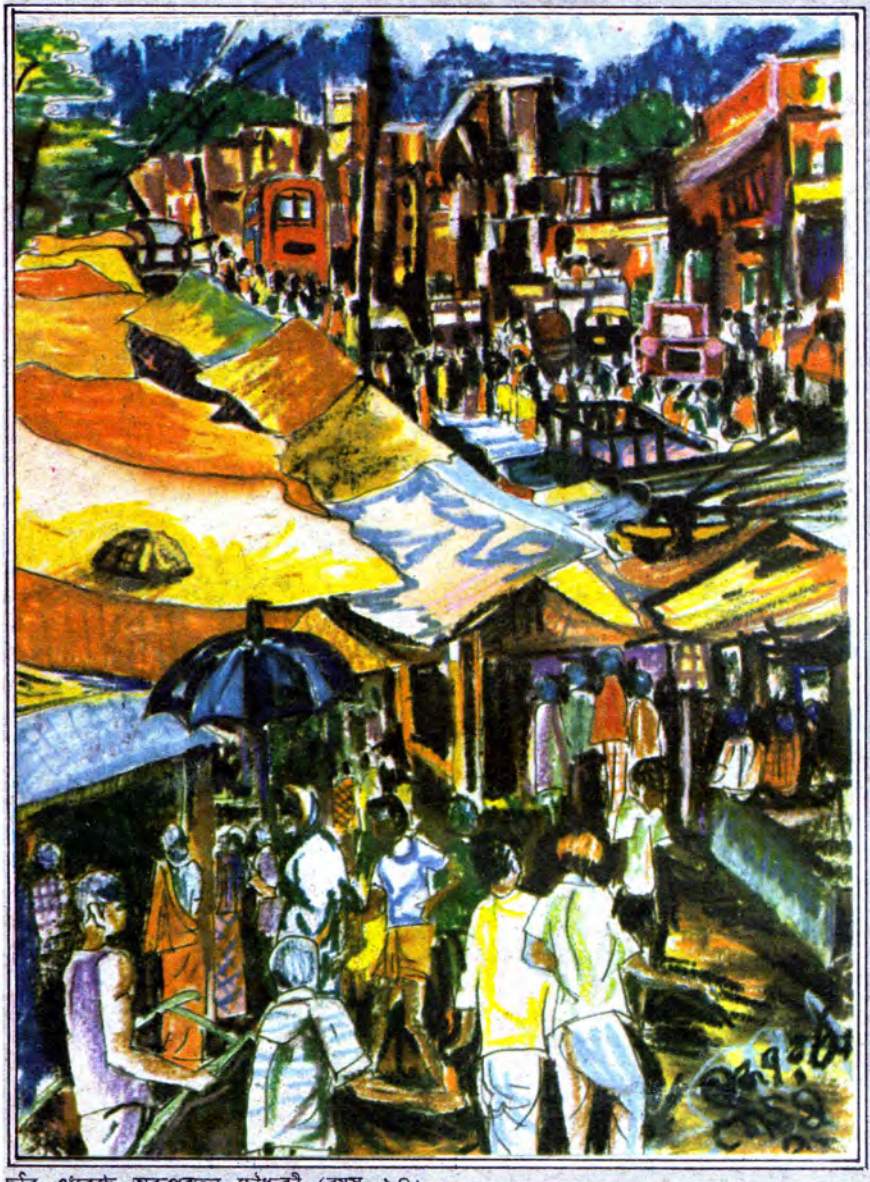

ছবি এঁকেছে অরুপরতন চৌধুরী (বয়স—১৪)

বই মেলা

কলকাতার বই-মেলায় শেষ দিনে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। সাড়ে-তিনটেয় লাইনে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম চারটের সময়। সব দোকানেই ঠাসাঠাসি ভিড়। যে-দোকানগুলোয় কোনোরকমে ঢুকতে পারলাম সে-সব জায়গায় আবার ছোটদের ভাল বই নেই, কিংবা থাকলেও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ঘুরতে-ঘুরতে এক সময় বই-বাজারের কাছে এসে পড়লাম। এখানে এসে অনেক কষ্টে আমার পছন্দমত একটা বই কিনলাম। বই-বাজারের বইগুলি সব শোয়ানো ছিল। তার ফলে সামনে এক সারি লোক দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে পেছনের লোকদের বই দেখতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল, বিশেষ করে আমাদের মতো ছোটদের। বইগুলো যদি উঁচু জায়গায় থাক-থাক করে সাজানো থাকত তাহলে সামনে যত লোকই ভিড় করুক না কেন পেছনের লোকদের বই দেখতে কোনো অসুবিধে হত না। মেলার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও বসার কোনো জায়গা ছিল না। আমরা সাতটার সময় বেরুলাম, কিন্তু তখনও মেলায় ঢোকার জন্যে বিশাল লাইন।

জয়জিৎ লাহিড়ী (বয়স—১০)

বারান্দায় ভূত

একদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকাতেই দেখি বারান্দায় কেমন যেন একটা ছায়া। তারপর দেখলাম, এক ভদ্রমহিলা ম্যাক্সি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে সেই ছায়ামূর্তিটি দোল খেতে লাগল। আমি তখন ভীষণ চিৎকার করে উঠতেই পাশের ঘর থেকে বাবা ছুটে এলেন। আমি ভূত দেখেছি শুনে তিনি টর্চের আলো ফেললেন বারান্দায়। তারপরেই জোরে হেসে উঠে বললেন, 'ওখানে তো আমাদের কাজের বউয়ের শাড়ি ঝুলছে।'

ঝুমা আচার্য (বয়স—১৩)।

চোর ধরতে

'পুলিস ভায়া পুলিস ভায়া,
কোথায় যাচ্ছ ভাই?'
'চালতাডাঙায় চোর এসেছে
ধরতে চলি তাই।'

কৌশিক চৌধুরী (বয়স—৮)।

ছবি এঁকেছে অমিতাভ ঘোষ

শরৎ মেলা

২৬ জানুয়ারি আমরা পুরী প্যাসেঞ্জারে চেপে শরৎ-মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। দেউলটি স্টেশনে নেমে বাসে চড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি পানিত্রাসে পৌঁছুলাম। শরৎচন্দ্র যেসব জিনিস ব্যবহার করতেন, সেগুলো দেখে আমরা মেলা দেখার জন্য রওনা হলাম। লাইন দিয়ে প্রদর্শনীতে ঢুকলাম। প্রদর্শনী দেখলাম। তারপর বাড়ি ফিরে এলাম।

লুনা ঘোষ (বয়স—৭)।

চাঁদের আলোয়

হঠাৎ দেখি স্নিগ্ধ আলো,
বাইরেতে আর নেই যে কালো,
মাগো তোমায় লাগছে ভালো।
গাছের ফাঁকে চাঁদের আলো
ঘুচিয়ে দিল ভীষণ কালো,
পৃথিবী আজ মধুর হয়ে জাগল,
সবকিছুকেই আজকে হঠাৎ
নতুন-নতুন লাগল।

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—১২)

হিমালয়ান মোটর র‍্যালি

বিশ্বজিৎ গুহ

স্টার্টিং লাইনে গাড়ি দাঁড় করাতেই বুকের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এক্ষুনি শুরু হবে হিমালয়ান মোটর র‍্যালি। আমি একজন প্রতিযোগী, আমার হাত স্টিয়ারিংয়ে, চোখ সামনের দিকে। কান খাড়া করে রেখেছি যাত্রার নির্দেশ শোনার জন্যে। চারদিকে সামান্য থমথমে ভাব। মাঝেমধ্যে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক্-ধক্ শব্দ কানে আসছিল। একটু পরেই শুনতে পেলাম মার্শালের গলা—থার্টি সেকেন্ড্স্ টু গো—ফিফটিন—টেন—ফাইভ—ফোর—থ্রী—টু—ওয়ান—গো।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শুরু হল আমাদের যাত্রা। বিকেলবেলা, ঘড়িতে তখন ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশ বাজে। ৩১ মার্চ ১৯৭৮ সাল। যাত্রা শুরু হল এএ ই আই অফিসের সামনে থেকে গন্তব্য শিলচর। দীর্ঘ পথ। ১৬০৪ কিলোমিটার। রাস্তাঘাট সব জায়গায় ভাল নয়, বিপদের আশঙ্কাও আছে, কিন্তু সব আশঙ্কা ছাপিয়ে উঠেছিল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার উত্তেজনা। এমন উত্তেজনা অবশ্য আমার কাছে নতুন নয়, কেননা গত বারো বছরে আমি বারোটা মোটর র‍্যালিতে যোগ দিয়েছি।

জানো তো, কলকাতার রাস্তায় ভিড় লেগেই থাকে সবসময়, তার ওপর আবার র‍্যালি দেখার ভিড়। রাস্তার দুধারের জনতা হাত তুলে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। একসঙ্গে এত লোকের অভিনন্দন পেয়ে দারুণ ভাল লাগছিল, কিন্তু গাড়ি যে একেবারেই স্পীড তুলতে পারছে না! সময় বাঁধা, এখান থেকে প্রথম দফায় শিলিগুড়ি পৌছুতে হবে সাড়ে-এগারো ঘণ্টার মধ্যে।

ভি আই পি রোডে পেঁাছে স্পীড তুললাম। গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল বারাসতের দিকে। বারাসত লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে একটা মোরগ উড়ে এসে পড়ল চাকার নীচে কিন্তু কিছু করার নেই, রক্তাক্ত মোরগটাকে পেছনে ফেলে রেখে গাড়ি ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি যখন এলাম তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। গাড়ির স্পট লাইট জেবলে দিলাম। বেথুয়াডহরিতে এসে দেখি

রাস্তার দুধার আলোয় আলো। কী ব্যাপার! একটু কাছে আসতেই বুঝলাম উৎসাহী মানুষজন র‍্যালির গাড়িগুলো দেখার জন্যে মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বহরমপুর, মালদহ, রায়গঞ্জ একে একে পার হয়ে সারা রাত্রি ধরে গাড়ি চালিয়ে যখন আমরা শিলিগুড়ি পেঁাছুলাম তখন সকাল চারটে বেজে চার মিনিট। শিলিগুড়ির আকাশে তখনও রাতের তারারা রয়েছে, ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি। একটানা সাড়ে এগারো ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা, কিন্তু র‍্যালির এমনই উত্তেজনা যে, একটুও ক্লান্ত বোধ করলাম না।

শিলিগুড়িতে ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম নেওয়ার পরে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার আমাদের যেতে হবে গ্যাংটক, লাভা, ডামডিম হয়ে গৌহাটি। শিলিগুড়ি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়ি বিপদসংকুল পথ শুরু হয়ে গেল। নীচে বয়ে চলেছে তিস্তা, কিন্তু তার সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো সময় আমাদের নেই। গাড়ি চালাতে হচ্ছিল ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। রাস্তা কখনো চড়াই, কখনো উতরাই। চড়াইতে যে সময় নষ্ট হচ্ছিল, সে-সময়টা উতরাইতে পুষিয়ে নিচ্ছিলাম। পাহাড়ি রাস্তায় বেশি জোরে চালালে আবার বিপদ। রাস্তা আঁকা-বাঁকা, ফলে গাড়ি স্কিড করতে পারে, আর স্কিড করলেই পড়তে হবে দুহাজার ফুট নীচে তিস্তার কোলে। ক্রমশ এগিয়ে যেতে লাগলাম গ্যাংটকের দিকে। পথে পড়ল সিংটাম, রংপো, রানীপুল। রানীপুল থেকে রাস্তা বেশ চড়াই, গাড়ি যেন আর টানতেই চায় না। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার দিয়ে

গাড়ি নিয়ে কোনো রকমে যখন গ্যাংটকে পৌছুলাম তখন সকাল নটা বাজে। গ্যাংটকের কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমাদের 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর কথা মনে পড়ছে, আমরা কিন্তু গণ্ডগোলের বদলে পেয়েছি প্রচুর অভ্যর্থনা, অভিনন্দন, ফুলের তোড়া, কেক বিস্কুট লজেন্স ইত্যাদি। সবই দিয়েছে তোমাদের মত ছোট-ছোট ভাইবোনেরা।

গ্যাংটকে পনেরো মিনিট থাকার পরে গাড়ি নিয়ে ছুটতে লাগলাম লাভার দিকে। লাভার উচ্চতা ৭,১০০ ফুট। গ্যাংটক থেকে প্রায় দু হাজার ফুট নীচে নেমে, আবার উঠতে আরম্ভ করলাম লাভার দিকে। ওইরকম চড়াই-রাস্তায় গিয়ার বদল করতে-করতে আর বাঁক নিতে-নিতে হাত আর পিঠে ব্যথা হয়ে গেল। কিছুদূরে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম পাঁচ নম্বর প্রান্ত-

যোগী—আমাদেরই বন্ধু অরিন্দম ঘোষকে। তার গাড়ির "গিয়ার বক্স" ভেঙে গেছে, অসহায়ভাবে মাথা চাপড়াচ্ছে বেচারা। সে অবশ্য হাত নেড়ে আমাদের এগিয়ে যেতে বলল।

দুর্গম রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি গাড়ি যেন খারাপ না হয়। আস্তে-আস্তে ৭,১০০ ফুটের পাহাড় ডিঙিয়ে গরুবাথান হয়ে নেমে এলাম সমতল ভূমি ডামডিমে। গাড়ির স্পীড তুললাম ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার।

তারপর আরও স্পীড তুললাম—৯৫-১০০।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রোদে গাড়ি চালিয়ে

যাচ্ছি গৌহাটির দিকে। ক্রমে দুপুরে গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। গৌহাটি পেঁছুতে আর বেশি দেরি নেই, মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার বাকি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ গাড়ির "সাইলেন্সর ক্ল্যাম্প" ভেঙে গেল। তার ফলে গাড়ি থেকে বেরুতে লাগল জেট প্লেনের আওয়াজ। ক্ষতিটা বেশ গুরুতর হতে পারত, কারণ যেখান থেকে ক্ল্যাম্পটা ভেঙেছিল, তার পাশেই ছিল কারবুরেটার। এর মধ্য দিয়ে গাড়ির পেট্রল ইঞ্জিনে যায়। আগুন লাগার ঝুঁকি নিতেই হল, কারণ মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটারের জন্যে তো আর প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে পারি না। গাড়ির যত না গতি, আওয়াজ তার দ্বিগুণ। গৌহাটি পেঁছুলাম রাত্রি সাড়ে-সাতটায়। সে-রাত্রে গৌহাটিতে বিশ্রাম। সাতাশ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পরে হোটেলের বিছানাটা যে কত আরামের লেগেছিল তা তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না।

পরদিন সকাল সাতটা চব্বিশ মিনিটে আবার যাত্রা শুরু হল। গাড়ি ছুটতে লাগল শিলং, জোয়াই, কাটিগোড়া হয়ে শিলচরের দিকে। বেশ ভালই লাগছিল সকালে গাড়ি চালাতে। আবার সেই পাহাড়ি আঁকা-বাঁকা পথ—কখনও চড়াই কখনও উতরাই। দেখতে-দেখতে শিলং পেঁছে গেলাম। লাল পতাকা দেখিয়ে অজস্র দর্শক আমাদের পথ অবরোধ করার চেষ্টা করল। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, থামব, না চলে যাব। গাড়ির গতি একটু কমাতেই শুরু হল চিকলেটস, টফি আর লজেন্সের বৃষ্টি গাড়ির মধ্যে। ভালই হল। আমাদের খাবার-দাবার ফুরিয়ে এসেছিল, বাকি পথটা ওই দিয়ে চালিয়ে নিলাম।

শিলং ছেড়ে জোয়াইয়ের দিকে চললাম। সুন্দর রাস্তা, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে তোমাদের মত ছোট ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। খুব ভাল লাগছিল, ইচ্ছে করছিল একটু দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করে যাই, কিন্তু উপায় নেই। জোয়াইয়ের পরে রাস্তা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। সরু রাস্তা, প্রত্যেক বাঁকের মুখে ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। একটা ব্রিজের কাঠের রেলিং ভাঙা দেখে বুঝতে পারলাম সামনের কোনো গাড়ি স্পীড কন্ট্রোল করতে না পেরে রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা মেরেছে। নীচে অবশ্য কোনো গাড়ি পড়ে নেই। যাক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন একজন। নীচে পড়লেই মৃত্যু।

বেলা আড়াইটার সময় শিলচরে কাছাড় ক্লাবের সামনে র‍্যালির সমাপ্তি হল। অসংখ্য দর্শক বাহবা জানিয়ে, ফুল ছড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল প্রতিযোগীদের।

দুঃসাহসিক অভিযান

কর্টেজ

স্পেনের হেরনার্তো কর্টেজ আমেরিকায় প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়েসেই আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নতুন পৃথিবীতে পেঁছুতে পেরেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি দ্বীপে পেঁছেই তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, "আমি তো এখানে সাধারণ চাষাদের মতো জমি চাষ করতে আসিনি, এসেছি সোনার সন্ধানে।" কিন্তু অন্যান্য স্পেনীয়দের মতো কয়েকজন ক্রীতদাসের সাহায্যে তাঁকেও জমির চাষবাসের তদারকিতেই লেগে পড়তে হয়েছিল।

এই সময় ওখানকার গভর্নর ভেলেস্কুয়েজ মেক্সিকোতে একটি অভিযাত্রী দল পাঠাবার পরিকল্পনা নেন। কর্টেজ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনি কর্টেজকেই এ-কাজের ভার দিলেন। ১৫১৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অভিযান শুরু হয়। মেক্সিকোতে এসে কর্টেজের সঙ্গে একজন ইউরোপীয়ানের দেখা হল। তার কাছ থেকে তিনি মেক্সিকোর বিখ্যাত অ্যাজটেক্ সাম্রাজ্য, সম্রাট মণ্টেজুমা ও তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারলেন, কিন্তু কর্টেজ লোকটির কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু তাঁর তাঁবুতে যখন রাজপ্রতিনিধিরা ১০০ জন ক্রীতদাসের হাতে নানা দামী উপহার চাপিয়ে এলেন, তখন কর্টেজ বুঝতে পারলেন যে, অ্যাজটেক্-সম্রাট সত্যিই ধনী।

মেক্সিকো অভিযানে কর্টেজের ভাগ্য খুব প্রসন্ন ছিল, কারণ প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী মেক্সিকোবাসীদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে-দেশে একজন নতুন দেবতা আবির্ভূত হবেন, তাঁর গায়ের রঙ হবে সাদা। কর্টেজকেই তাঁরা দেবতা ভাবলেন। সম্রাট মণ্টেজুমাও ভেবে উঠতে পারলেন না যে, এই পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন! রাজদূতেরা আবার নানা প্রকার উপহার নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কর্টেজ রাজি হলেন না। কিছুকাল পরে তিনি উপজাতীয়-প্রধানদের সাহায্যে অনেক বাধা পেরিয়ে রাজধানী মেক্সিকোতে এসে পেঁছুলেন। মণ্টেজুমাকে তখন অনেকে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। কেউ-কেউ আবার বললেন, কর্টেজকে দেবতা হিসেবে বরণ করে নাও। রাজা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দলের কথাই মেনে নিলেন। ১৫১৯ সালের ৮ নভেম্বর কর্টেজ গেলেন রাজদর্শনে। রাজাও এগিয়ে এলেন মণি-মাণিক্যখচিত পালকিতে চড়ে। মণ্টেজুমা কর্টেজকে বললেন, "আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমরা মেক্সিকোবাসীরা আনন্দিত।" কর্টেজ মণ্টেজুমার গলায় পরিয়ে দিলেন একটি রঙিন স্ফটিকের মালা।

তারপর মণ্টেজুমাকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, এবং মেক্সিকো অধিকার করা—আর-এক কাহিনী। ১৫২১ সালে মেক্সিকো শহরের পতন হয়। ১৫২৮ সালে কর্টেজ সুদীর্ঘ ২৪ বছর পরে আবার স্পেনে ফিরে এলেন।

দিদিমণি

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

নতুন গল্পের শুরু...

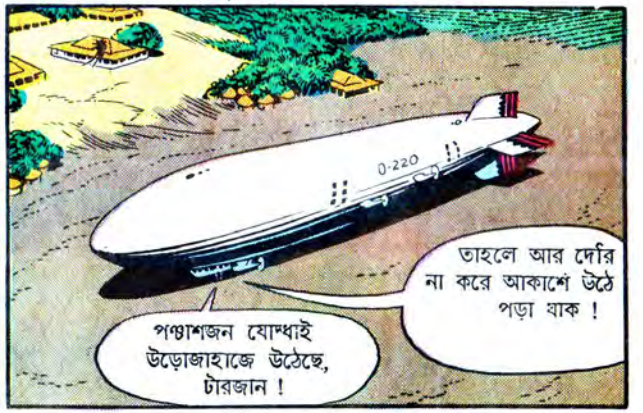

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

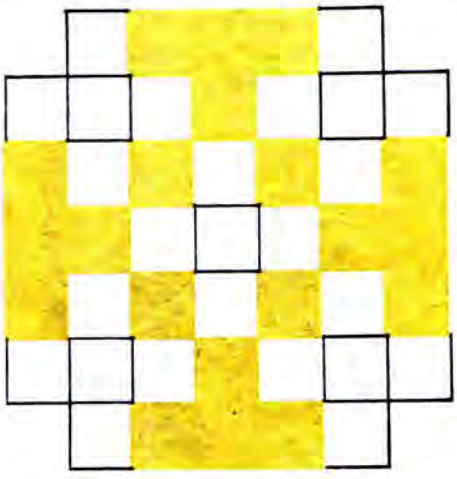

এবারে দেওয়া হল উলট শব্দ-সন্ধান। ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ পাশাপাশি আর উপর-নীচ মিলিয়ে পাঁচ-পাঁচ হিসেবে মোট দশটি শব্দ দিয়ে ছকটি পূরণ করতে হবে। শর্ত একটাই—পাশাপাশি যে-শব্দ হবে, উপর-নীচে সেটা উলটো হয়ে বসে অন্য শব্দ তৈরি করবে। যেমন, পাশাপাশি যদি 'শেরপা' হয় উপর-নীচে হবে 'পারশে'। এই-যে সংকেত দিলাম, এটা বাদে নিজেরা ভেবেচিন্তে পাঁচটা শব্দ বার করো তো, যা নাকি দশটার কাজ করবে! পাঁচটা সংকেত দেওয়া থাকলে হয়তো সুবিধে হতে পারে।

(১) ভয়হীনতা। (২) জলচর প্রাণী। (৩) ব্যাকরণের বিষয়। (৪), (৫) দুটিই স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ, পেশা বোঝায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

১ম	শ	২ক		৩অ	ম্ব	৪র
গ		দ		ঞ্চ		ঙ্গ
	৫দ	ম		৬ল	ব	
৭নি	ষা	৮দ		৯রে	ব	১০তী
ম		ক্ষি		কা		র
	১১প	ণ		১২ব	র	

ধাঁধা

ভাল লোকেরা বলেন, 'পঞ্চবটী'। যদিও পাঁচ রকম গাছটাছ কিছুই নেই। ছোট্কার পাঁচ বন্ধুর বাড়ি। পাশাপাশি। শুধু বাড়ির নামে যা একটু মজা রয়েছে।

কিছু-কিছু খারাপ লোক আবার ঠাট্টা করে, মজা করে। কথা উঠলে বলে, 'পঞ্চভূতের বাড়ি।' বলা বাহুল্য, ভূত কথাটা এখানে খারাপ অর্থেই ব্যবহার হয়। আসল পঞ্চভূতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

কিন্তু পঞ্চবটীই হোক আর পঞ্চভূতই হোক কিংবা পঞ্চরত্নই বলা যাক, পাঁচ বন্ধুর বাড়ির নামে যে চমৎকার ধাঁধা লুকনো রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ছোট্কা শুধু সে বাড়ির গল্পই বলছিল তা নয়, ধাঁধাটাও যে কত মজার তাও বলল। এবারের প্রথম ধাঁধাটা তাই সেই বাড়ির নাম নিয়েই।

প্রথম ধাঁধা ॥ পাঁচ বন্ধু। শান্তি, বিনয়, লক্ষ্মণ, গোবিন্দ এবং ইন্দু। পদবীর কথা আর বললাম না। কেননা পদবী জড়ালে আরও জট পাকিয়ে যেতে পারে।

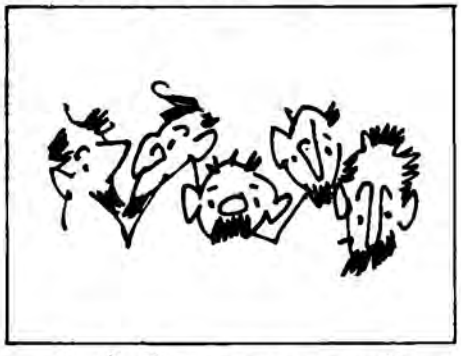

তা এই পাঁচ বন্ধুর প্রত্যেকের একটি করে মেয়ে। প্রত্যেকেই তাঁর বাড়ির নাম রেখেছেন অন্য কোনও বন্ধুর মেয়ের নামে। এক নামে দুটো বাড়ি নেই, কেননা পরামর্শ করে দেওয়া হয়েছে নাম।

শান্তির বাড়ির নাম 'ইরা'—বিনয়ের মেয়ের নাম অনুসারে এই নাম। বিনয়ের নিজের বাড়ির নাম 'ডালিয়া।' ইন্দুর বাড়ির নাম 'যূথিকা'। গোবিন্দ তাঁর বাড়ির নাম রেখেছেন 'অনীতা'।

ডালিয়া হল সেই বাড়ির মালিকের মেয়ে, যিনি নিজের বাড়ির নাম রেখেছেন লক্ষ্মণ-বাবুর মেয়ের নামে। ইন্দুর মেয়ের নাম—লাবণ্য।

বলতে পারো, যূথিকার বাবা কে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ 'পঞ্চবটী' কী তা তো জানো নিশ্চয়ই। বলো তো 'পঞ্চভূত' কী-কী?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ ২ এবং ৩-এর মধ্যে এমন কোন্ অঙ্কের চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে এমন একটা সংখ্যা হবে যা ২-এর থেকে বড় অথচ ৩-এর থেকে ছোট?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ বই-মেলাতে একটা বই কিনলাম যার দাম পড়ল ১ টাকা এবং পুরো দামের অর্ধেক টাকা। বইটার পুরো দাম কত?

গতবারের ধাঁধার উত্তর ॥

(১) লোকটি যে 'বামন', সেটা মনে রাখতে হবে, আর মনে রাখতে হবে, লিফটে ওঠা-নামা করার জন্য বিভিন্ন তলার বোতাম-গুলো কীভাবে সাজানো থাকে সেই ছবিটি। বামন বলেই দশ-তলার থেকে উঁচু বোতামে হাত পৌঁছয় না তাঁর, এইটেই হচ্ছে ধাঁধার সম্ভাব্য উত্তর। কিন্তু নামার সময় গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতামের নাগাল ঠিকই পান তিনি। তাই কুড়ি তলা থেকে নামতে কোনও অসুবিধে হয় না।

(২) প্রথম কাজ হবে—দ্রুতগামী এবং পলায়নপর লরিটির নম্বর নেওয়া।

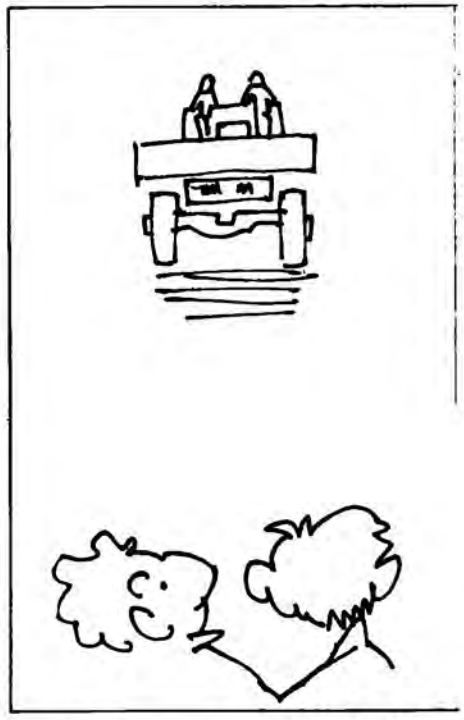

(৩) কোনও মানুষের পক্ষেই নিজের মাথাটিকে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আত্মহত্যা করা সম্ভবপর নয়।

(৪) মোজা ও গেঞ্জির দাম ৩-এর গুণিতক। সাবান ও রুমালের সংখ্যাও ৩-এর গুণিতক। তাহলে পুরো দামটি ৩-এর গুণিতক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলা হয়নি।

এর ফলেই অন্য বন্ধুটির সন্দেহ জেগেছে যে দাম বলায় কোনও ভুল হয়েছে।

ছবি অহিভূষণ মালিক

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান
গতবারে ছিল ঘুঙুরের ছবি
ফোটো তপন দাস

প্রঃ রামায়ণে কার কানে মাকড়ির বদলে কলসি ঝুলত?
উঃ কুম্ভকর্ণের।

প্রঃ ফুল থেকে কী করে ফল হয়?
উঃ ছাপার ভুলে হ্রস্ব-উ যখন খসে পড়ে।

প্রঃ অঙ্কের মাস্টারমশাই যখন ক্লাসে বলবেন, যারা হোম-টাস্ক করে আনোনি, তারা বেঞ্চের উপর দাঁড়াও, তখন তুমি কী করবে?
উঃ আমার কিছু করার প্রশ্নই উঠবে না, যেহেতু সেজমামার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে সেদিন আমি ত্রিবেণী চলে যাব।

প্রঃ বলো তো কোন্ ধাতু ছোটদের আজকাল সবচাইতে প্রিয়?
উঃ টিন টিন।

প্রঃ নীচে যেতে বলা সত্ত্বেও কোথায় উপরেই জিনিসপত্র রাখা যায়?
উঃ গোডাউন-এ।

প্রঃ প্রচুর পরিমাণ এবং ফোঁড়ার ব্যথা এক কথায় কী করে বোঝানো যায়?
উঃ টন টন।

প্রঃ কোন্ ভাষার অনুস্বর বাদ দিলে মাছ?
উঃ ইংলিশ।

প্রঃ কার মাসীর গোঁফ আছে?
উঃ বাঘের।

স্নুসেন

মজার খেলা

এবারের খেলাটা প্রায় ম্যাজিকের মতো মজাদার। একটা ভর্তি দেশলাইকাঠির বাকস দরকার শুধু। তাই দিয়েই দেখানো যাবে এই মজার খেলা।

খেলার আগে তুমি তোমার পকেটে গোটা-এগারো দেশলাই-কাঠি আলাদা করে রেখে দাও। এবার বাকি কাঠিসুদ্ধ বাকসটা যে-কোনও বন্ধুর হাতে দিয়ে বলো, তোমাকে না জানিয়ে সে যেন ইচ্ছেমতো কিছু কাঠি বাকস থেকে বার করে তার হাতে নিয়ে নেয়। কটা কাঠি নিল, তোমাকে একদম জানাবে না সে। এবার তোমার পকেটে আগে থেকে রাখা কাঠি থেকে কয়েকটা কাঠি তুমি হাতে নিয়ে নাও। কটা কাঠি নিলে বন্ধুকে দেখাবে না। এবার তাকে বলো, "তুমি কটা কাঠি নিয়েছ আমি জানি না। আমার হাতেও কয়েকটা কাঠি রয়েছে। কটা কাঠি তা তুমি জান না। আমি আমার হাতের কাঠি কটা তোমার হাতের কাঠির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তার ফলে একটা আশ্চর্য কান্ড ঘটবে।" এই বলে একটুক্ষণ চুপ করে থাকো। বন্ধুরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইবে, কী কান্ড ঘটবে। তাদের কৌতূহল উশ্‌কে দিয়ে এবার বলো, "এর ফলে তোমার হাতের আগের কাঠি যদি জোড়সংখ্যক হয়ে থাকে তাহলে এখন তা বিজোড়সংখ্যক হয়ে যাবে। আর আগে যদি বিজোড়সংখ্যক থেকে থাকে, এখন তা হবে জোড়সংখ্যক।" এই বলে তোমার হাতের কাঠি কটা বন্ধুর হাতে দিয়ে দাও। একসঙ্গে মেশানো কাঠিগুলো নতুন করে গুনে দেখতে বলো এবার। সত্যিই অবাক কান্ড। আগে যদি বন্ধু জোড়-সংখ্যক কাঠি নিয়ে থাকে, এখন তা বিজোড় হয়ে গেছে। আর বিজোড় নিলে, তা হয়েছে জোড়-সংখ্যক।

কী করে হবে ভাবছ? কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। তুমি পকেট থেকে যে-কাঠিগুলো নিয়ে বন্ধুর কাঠির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে তা যেন বিজোড়সংখ্যক কাঠি হয়। তাহলে বাকিটুকু নিজে-নিজে ঘটবে। কেন বলো তো? কেননা, বিজোড় + বিজোড়=জোড়। জোড় + বিজোড় =বিজোড়। বন্ধু আগে থেকে বিজোড়ই নিক, বা জোড়ই নিক, তোমার হাতের বিজোড় সংখ্যক কাঠি (১, ৩, ৫, ৭, ৯ বা১১) মিশলে তার হাতে যা ছিল তার উল্টোটা হয়ে যেতে বাধ্য। এই সহজ ব্যাপারটা ঠিকমতো দেখাতে পারলে ম্যাজিক বলে মনে হবে।

মজারু

আটখানা

এবারে আটখানা দিয়ে পাখির ছবি করেছি। কী পাখি, তা বুঝতেই পারছ। দেখতে কুৎসিত, কেউ ভালবাসে না ওকে, আকাশে ওকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে নিতে হবে, ধারে-কাছে কোথাও কোন শবদেহ আছে। এই সেই শকুন যাকে দেখলেই কেমন ভয় করে। ফাঁকা মাঠে এদের ঘুরতে দেখা যায়। একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে বড় গাছেও থাকে অবশ্য। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, শকুনটি ডালে বসে একমনে লক্ষ করে চলেছে নীচের দিকে। এবারে আট টুকরো দিয়ে তোমরা এটিকে বানাও।

সমাধান আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার সমাধান

অসিত পাল

দুম্!

আরে, কী হল ক্যাপ্টেনের?

কী হল? বন্দুক চালালে কেন?

ওই খোঁটাটায় ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলুম, আর বন্দুকটাও অমনি ছুটে গেল!

উঃ!
উঃ!

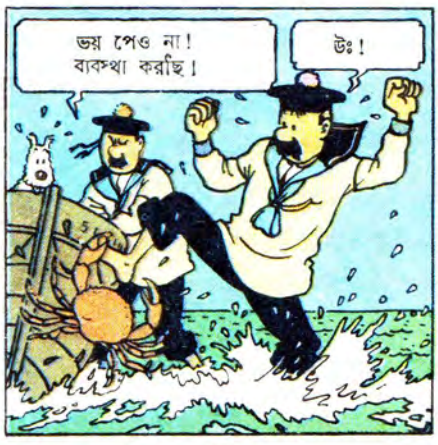
ভয় পেও না! ব্যবস্থা করছি!
উঃ!

এই যে...

বাবা গো!

গেলুম!
মরলুম!

এসো তো, দুজনে মিলে এই খোঁটাটাকে তুলে ফেলি!

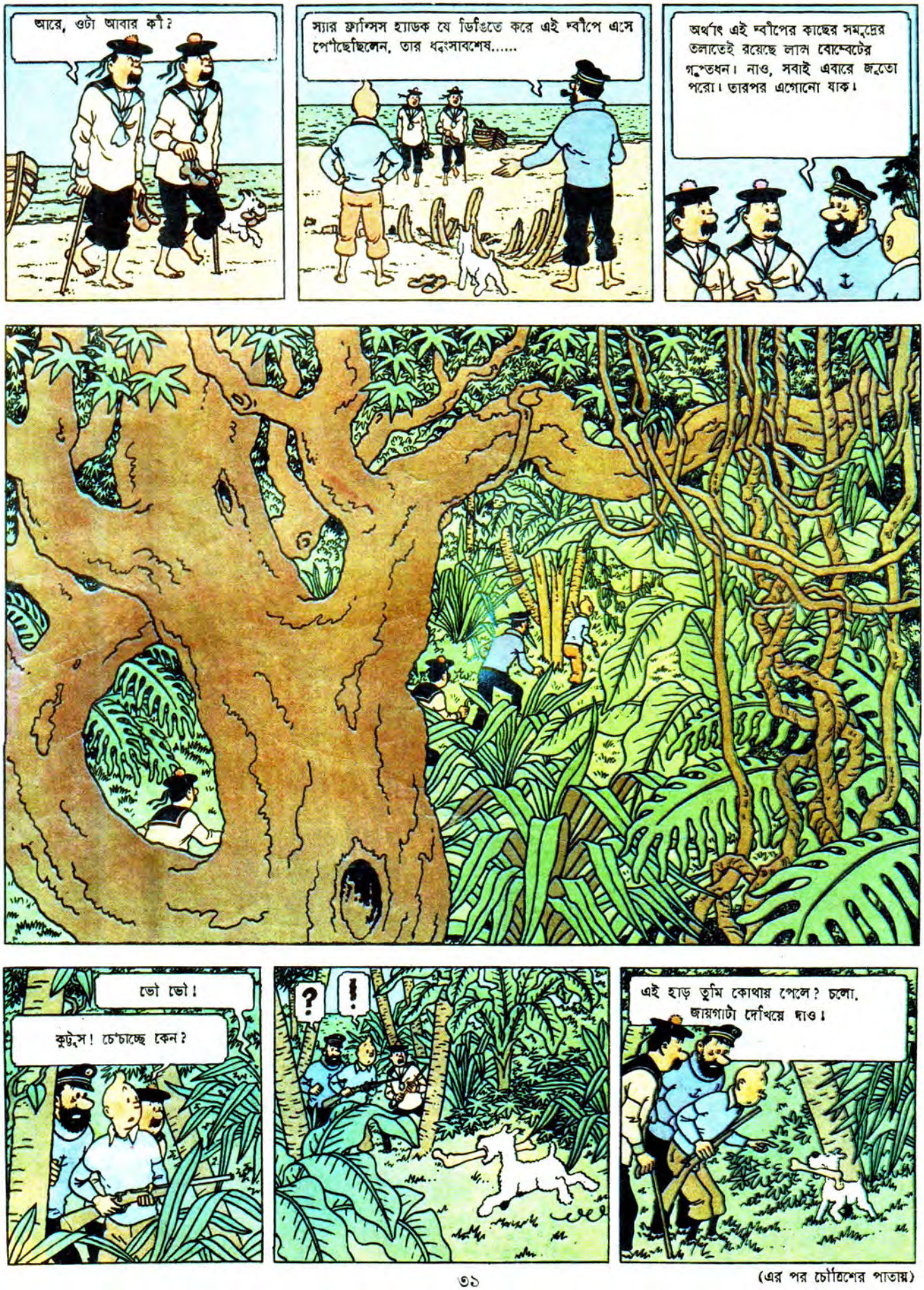

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

লেখাপড়া

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

হেয়ার স্কুল আর হিন্দু স্কুল। যেন একই বৃন্তে দু'টি ফুল। একটির কথা তুললে অপরটির কথা উঠবেই। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেস্ট, কিংবা অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৌকা-বাচ নিয়ে কি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল লড়াইকে ঘিরে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলেজ স্ট্রীটের দু' পাশের এই স্কুল দুটির মধ্যে। প্রতিযোগিতা অন্য কিছুর নয়, ভাল ফল করার। বেশি স্ট্যান্ড করার।

মহামতি ডেভিড হেয়ারের অক্ষয় কীর্তি তাঁর নামাঙ্কিত স্কুলটি। দেখতে-দেখতে একশ' ষাট বছর বয়েস হয়ে গেল এর। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হেয়ার থেকে কত ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছে তার তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিংবা, উত্তরজীবনে যে-সব ছাত্র দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের নামের তালিকাও। তবে হেয়ার স্কুলের কয়েক-জন কৃতী ছাত্রের নাম কারও অজানা নেই। যেমন—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামতনু লাহিড়ী, প্যারী সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রধান-শিক্ষকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী। বললাম, আপনার স্কুলের ভাল ফলের গোপন রহস্যটি প্রকাশ করুন আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। উনি বললেন, "বিশেষ একটা কিছু রহস্য নেই—যদি 'রহস্য' শব্দটি আদৌ ব্যবহার করা যায়। তবে আমাদের স্কুলের লেখাপড়ার অনেক-গুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, আমরা পরিমাণের চেয়ে গুণের উপর বেশি জোর দিই। অর্থাৎ 'কতটা পড়ান হল'র চাইতে 'কীভাবে পড়ান হল'র উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সব সময় বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পড়ান হয়। যাতে ছেলেরা বিষয়টি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। এটা করতে গিয়ে হয়তো কোনও-কোনও সময় 'সিলেবাস' শেষ করা যায় না; তবুও এতেই বেশি ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত, যে-কোনও বিষয় পড়িয়েই আমরা তার থেকে এমন প্রশ্ন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করি যেগুলির উত্তর দিতে-দিতে বা শুনতে-শুনতে তারা আলোচিত বিষয়ের মূলে চলে যাবে। তৃতীয়ত, ছেলেরা নিজেরা যা বুঝেছে, যাতে সেটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে—তা ঠিকভাবেই হোক আর ভুলভাবেই হোক—সেদিকে আমরা সব সময় দৃষ্টি রাখি। ভুল করলে আমরা তো আছিই। আমাদের কথা হচ্ছে "এক্সপ্রেস ইয়োরসেল্ফ ইন ইয়োর ওন ওয়ে, রাইট অর রং।" চতুর্থত, আমরা পরীক্ষায় এমন কিছু প্রশ্ন দিই যা আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ মনে হলেও ভাল ছেলেদের কাছে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। যেমন, "মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ" লিখতে দিলে অনেকেই তৈরি উত্তর লিখবে। কিন্তু এটাকেই যদি একটু-বদলে এইভাবে দেওয়া হয়ঃ "কী কী উপায় অবলম্বন করলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন এড়ান যেত?", তাহলেই প্রকৃত যাচাই করা যায় কে ভাল আর কে নয়।

বীরেশ্বরবাবু মনে করেন ভাল নম্বর তুলতে গেলে উত্তরের মধ্যে মৌলিকতা থাকা চাই। একটা সাহিত্যগুণ থাকা চাই। প্রকাশভঙ্গির উপর দৃষ্টি দিতে হবে। উত্তর তথ্যবহুল হতে হবে। এবং পরীক্ষার্থীকে সব সময় একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

বীরেশ্বরবাবুর অন্যতম সাবজেক্ট ইংরেজি। বললেন, বর্তমান সিলেবাসের ফলে "ডবু-এইচ"-জাতীয় প্রশ্নের ছড়াছড়ি। ওতে ইংরেজি শেখার সুযোগ নেই। যে ছেলে বা মেয়ে ফ্রেজ, ইডিয়ম, বানান জানে না, সেও "হল-কালেকশান" করে বেশ নম্বর সংগ্রহ করতে পারে ফ্রেজ-ইডিয়মের প্রশ্নের উত্তরে। দেখলাম, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত ইংরেজির অন্যতম শিক্ষক শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়। উনি মনে করেন, ইংরেজিতে ভাল করতে গেলে ভাল-ভাল ইংরেজি বই পড়া দরকার। আর দরকার রোজই কিছু লেখার কাজ করা। "আজকের দিনটা" বা "ক্লাসরুম" সম্পর্কে এক পৃষ্ঠা-দেড় পৃষ্ঠা লিখতে বললেই দেখা যাবে, যে বেশি পড়ে না, সে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

বাংলা ও সংস্কৃত সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বললেন, বাংলাতেও বিভিন্ন লেখকের ভাল ভাল বই পড়া দরকার। যে যে-ভাষাতে উত্তর লিখবে—সাধু বা চলতি—আগাগোড়া যেন সেটাই বজায় রাখে। লেখা যেন খাপছাড়া না হয়। আর অনুবাদ আক্ষরিক হলে অনেক সময় সেটা হাস্যকর হয়ে যায়। সংস্কৃতে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম পরিশ্রম করে বেশি নম্বর পাওয়া যায়। তবে অক্ষরপরিচয় ভালরকম দরকার হয়, কেননা দেবনাগরী হরফে প্রশ্ন হয়। টেক্সট থেকে বঙ্গানুবাদ সাধু ভাষায় করার চেষ্টা করা উচিত। ব্যাকরণ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও কৃৎ-তদ্ধিতের উপর জোর দেওয়া দরকার। সংস্কৃতে ভাল অনুবাদ করতে গেলে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারে রপ্ত হতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে যে, কর্ম-বাচ্যের ব্যবহারেই সংস্কৃতে দখলের পরিচয় পাওয়া যায়।

অঙ্কে সবচেয়ে দরকারী কথা হল, প্রতিটি স্টেপ যুক্তি দিয়ে বোঝানো চাই। বিশেষত জ্যামিতিতে। অঙ্কন সুন্দর হওয়া দরকার। আর হাতের লেখা পরিষ্কার না হলে ঠিক উত্তর লিখেও কম নম্বর বা শূন্য পাবার সম্ভাবনা। অঙ্কের জন্যেও একাধিক বই ব্যবহার করা দরকার, বললেন শ্রীগোপালদাস চক্রবর্তী। তাঁর মতে একটা বিষয়ের উপর যত বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক হতে পারে সব করে রাখা দরকার।

ইতিহাসের কথা ওঠায় বীরেশ্বরবাবু বললেন যে, উত্তর সব সময়ে সমালোচনামূলক হবে। আর তথ্য পরিবেশনে ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। ভাষার প্রাঞ্জলতা দরকার। "বেশি লিখলে বেশি নম্বর"—ইতিহাস সম্পর্কে এ-ধারণা ভুল। উত্তরে যেন অবান্তর কথা না থাকে। সর্বোপরি পরীক্ষককে বোঝাতে হবে যে, পরীক্ষার্থী প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পেরেছে। ভূগোলের শ্রীভজন সেন বললেন, বর্তমান সিলেবাসে ভূগোলে ভাল করতে গেলে প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে চোখ খুলে রাখতে হবে। এটাই মূল সূত্র। 'পিনপয়েন্ট' উত্তর দিতে হবে। "ভারতের কোথায় মৎস্যের ব্যবহার সর্বাধিক?" প্রশ্নের জন্যে চার নম্বর থাকাতে উত্তরে "পশ্চিমবঙ্গ" ছাড়া আরও অনেক জায়গার নাম লিখে একবার ছেলেমেয়েরা ভুল করেছিল। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় প্রশ্ন বুঝতে পারে না। "হিমালয় পর্বতকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়"—না বুঝে এর উত্তরে অনেকে অন্য জিনিস লিখেছিল। সুতরাং প্রশ্ন ঠিকভাবে বুঝতে পারা দরকার।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রীসমর সরকার বললেন, 'অবান্তর কথা লেখা চলবে না'—এটা ফিজিক্যাল সায়েন্সেও খাটে। আর এখানেও ভাষার দিকে নজর দেওয়া দরকার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছবি আঁকা চাই। আর উত্তর, বলা বাহুল্য, সঠিক ও পয়েন্ট অনুযায়ী হবে। জীবন-বিজ্ঞানেও তাই। প্রথমে যে কোনও একটা ভাল বই ভাল করে পড়ে তার সঙ্গে অন্যান্য বই মেলানো দরকার। জীবন-বিজ্ঞানে ডায়াগ্রাম খুব ভাল করে অভ্যাস করা দরকার। এবং লক্ষ রাখতে হবে যেন "লেবেলিং" ঠিক হয়।

কিন্তু এ-সব করেও ভাল ছেলেরা অনেক সময় ভাল নম্বর পায় না—আক্ষেপ করলেন বীরেশ্বরবাবু। হেয়ারেরই বিশ্বজিৎ মহান্তি, যে গত মাধ্যমিকে থার্ড হয়েছে, তাকে ইতিহাসে মাত্র ৪৩ নম্বর দেওয়া হয়েছে। বিশ্বজিৎ স্কুলে ৭৫-এর কম কখনও পায়নি। অসীমবাবু বললেন, ১৯৫৩ সালে একটি ছাত্র ইংরেজি ফার্স্ট পেপারে ৭৮ পেয়েছিল; অথচ প্রথমে তাকে ৪২ দেওয়া হয়েছিল। তার খাতায় শুদ্ধ জায়গাতেও দাগে ভর্তি। পরে অবশ্য সে ইংরেজিতে লেটারই পায়। ছেলেটির নাম গঙ্গাধর যশ।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় সৌম্যেন্দ্রনাথ পাল। এ-পর্যন্ত একবারই সেকেন্ড হয়েছে। ওয়ান-এর অ্যানুয়ালে। এই হেয়ার স্কুলেই। সৌম্যেনরা থাকে স্কুলের কাছেই, রমানাথ কবিরাজ লেনে। সৌম্যেনদের বাড়িতে আছেন তাঁর বাবা শ্রীসুধীরচন্দ্র পাল, মা ও ভাই। সুধীরবাবু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সৌম্যেনের ভাই হিন্দু স্কুলে পড়ে।

সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, "মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করছ তো?"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "অত আশা এখনই করছি না; তবে ভাল ফল করতে পারব, সে-বিশ্বাস আছে।"

তের বছরের কিছু বেশি বয়েসী ছেলেটি। নিয়মিত আনন্দ-মেলা রাখে। কোন্ কোন্ বিভাগ ভাল লাগে? লেখাপড়া আর ধাঁধা-মজা-রহস্য। লেখাপড়া বিভাগ ভাল লাগার কারণ, "অন্যান্য স্কুলের ভাল ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়।"

সৌম্যেন ইংরেজি ও বাংলা মোটামুটি একভাবেই পড়ে। টেক্সটটা ভাল করে পড়ে নিয়ে, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দগুলো অভিধান থেকে তৈরি করে। টেস্ট পেপার্স থেকে এবং স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে সেগুলো শিক্ষকদের দিয়েই সংশোধন করিয়ে নেয়। অন্যান্য বিষয়ে একাধিক বই পড়ে এবং শিক্ষকদের দেওয়া নোটস বা আদর্শ প্রশ্নোত্তরগুলির সাহায্যে উত্তর তৈরি করে। সংস্কৃতে সৌম্যেন সবচেয়ে বেশি জোর দেয় ব্যাকরণের উপর।

সৌম্যেনের স্কুলে পড়ানো হয় শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য ও জাহ্নবী চক্রবর্তীর বই এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-কাঞ্জিলাল-হালদার। রচনার জন্যে ও এর উপর পড়ে পি. আচার্যর রচনা-বিচিন্তা। ইংরেজি গ্রামার ও কম্পোজিশনের জন্যে ব্যবহার করে ধরণীমোহন মুখার্জী, পি. কে. দে-সরকার আর রেন অ্যান্ড মার্টিন। সংস্কৃতে দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত ব্যাকরণ-কৌমুদী এবং এস, এন, শাস্ত্রীর "এ টেক্সট বুক অন গ্রামার, ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কম্পোজিশন অন টেক্সচ্যুয়াল মেথড।" এর সঙ্গে সুবিখ্যাত "হেল্পস টু দ্য স্টাডি...।" দুই অঙ্কের জন্যেই স্কুলে কেশব নাগের বই পড়ানো হয়। আর ম্যাকমিলান কোম্পানির মাধ্যমিক জ্যামিতি। সৌম্যেন আরও পড়ে দাশ ও বর্মণ এবং ঐচ্ছিক গণিতের জন্যে দাশ-মুখার্জী। ভূগোলে স্কুলের ভজনবাবুর বই, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও লোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ইতিহাসে টেক্সট বিনয় ঘোষ, কিরণ চৌধুরী আর নিমাইসাধন বসু। ফিজিক্যাল সায়েন্সে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই পাঠ্য। সৌম্যেন অতিরিক্ত বই পড়ে ফিজিক্সের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত আর কেমিস্ট্রির জন্যে লমডলি মিত্র, সমর গুহ। সেইরকম লাইফ সায়েন্সে বাড়তি বই পড়ে তারকমোহন দাশ আর অমল চক্রবর্তী-বিশ্বপতি দাশ গুপ্ত। স্কুলের বই কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু।

সৌম্যেন শিক্ষকতা করতে চায়। জীবনের লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল যে, এই বৃত্তিতেই বিদ্যাদানের তথা বিদ্যা অর্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

(একত্রিশের পাতার পর)

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

লাটপঞ্চরের চোর ভালুক

গঙ্গেশ বিশ্বাস

হিমালয়ের কোলে সরকারের এমন কিছু পাহাড়ে-বন আছে, যেখানে মানুষ তো যায়ই না, সূর্যের আলোও সেখানে উঁকি দেয় কিনা সন্দেহ। দুর্গম বলে বনবিভাগ কোনভাবেই এই ধরনের বনকে কাজে লাগাতে পারে না। বনবিভাগের ভাষায় এই রকম বনকে বলে ভার্জিন-ফরেস্ট। এই সব বন যেমন জানা-অজানা নানা গাছে ভর্তি, তেমনি চেনা-অচেনা জন্তু-জানোয়ারও সেখানে অঢেল। সে-সব বনে এখনো বাঘে-ভালুকে মড়ি নিয়ে লড়াই হয়, অজগরে জন্তু গেলে, চিতা-বেড়ালের তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে ময়ূর আর বনমোরগ, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে বেড়ায় থার-ছাগল আর কস্তুর—যাকে বলে একেবারে জঙ্গলের রাজত্ব!

এমনি কিছু ভার্জিন-বন আছে শিভক-রেঞ্জের লাটপঞ্চর বন-এলাকায়। কার্সিয়াংয়ের নীচে যে পাহাড়ে-নদীটার নাম মহানদী, তার এক ধারে দার্জিলিংয়ের দিকটায় আছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে কতকগুলো চা-বাগান আর তিনধারিয়া-মহানদী-গয়াবাড়ি রেল স্টেশন—এই সবের সোজাসুজি নদীর ঠিক অপর পারেই কালিমপঙের দিকটায় লাটপঞ্চর-বন। শিভক-রেঞ্জের রেঞ্জ-আপিস কালিঝোরায়—শিভক-রেলস্টেশন থেকে তিন-চার মাইল কালিমপঙের দিকে, ঠিক তিস্তার ধারে। লাটপঞ্চর-বনের মধ্যে পাহাড়ে-রাস্তার শেষে বনবিভাগ যে বস্তিটা বসিয়েছে, তার নামও লাটপঞ্চর। কালিঝোরা থেকে লাটপঞ্চর-বস্তি, এই সাত-আট মাইল পাহাড়ে-পথের ধারে-ধারে বনবিভাগের আর দুটো বস্তি আছে—করমঠ আর শ্বেতিখোলা। বনে-বনে কুলি-মজুরের কাজ পাবার জন্য বিনা খাজনায় বস্তিওয়ালাদের বসিয়েছে বনবিভাগ। বাইরে থেকে লোক এনে বনের ভিতরে কাজ করাতে পারা যায় না বলে বনবিভাগকে বনের ভিতরেই জায়গায়-জায়গায় বস্তি বসাতে হয়।

লাটপঞ্চর বস্তিতে আছে বনবিভাগের একটা বাংলো, ফরেস্ট-গার্ডের জন্য একটা সরকারী বাড়ি, কুলিমজুরদের কিছু কাঠের বাড়ি, আর তাদের জন্য পাহাড়ের গায়ে-গায়ে থাক-থাক কিছু চাষের জমি। তাতে কখনো ফলে আলু, কপি, বিট, গাজর, টোমাটো, আলু-বোখরা, পেঁয়াজ, ফরাস-বীন, লেটুস, আর কখনো ফলে কোয়াস, চ্যাড়স, ভুট্টা—এইসব। বস্তির কেউ-কেউ দু-একটা নাশপাতি, আপেল আর কমলালেবুর গাছও রেখেছে শখ করে। লাটপঞ্চর-বস্তিটা ছিল চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে, তাই বারো মাসই সেখানে শীত। কালিঝোরা থেকে লাটপঞ্চর যাতায়াতের রাস্তার ধারেই ছিল একটা সিনকোনা বাগান ; একটা ছোট হাস-পাতালও ছিল সেখানে। কালিঝোরা থেকে প্রথম তিন মাইল বাদে বাকি রাস্তার ধারে-ধারে দাঁড়িয়ে আছে উতিস, সৌর আর চেরি গাছ। নানা রঙের ফুলে প্রায় বারো মাসই সেজে থাকে গাছগুলো। জিপে এই রাস্তা দিয়ে ওপরের দিকে যেতে-যেতে মনে হয় সামনেই বুঝি নন্দন-কানন।

লাটপঞ্চর-বস্তির নীচের দিকে ছিল বড় একটা ভার্জিন বন —একদিকে আট-দশ মাইল, আর একদিকে পাঁচ-সাত মাইল। খাড়া পাহাড়ে, আর তার ঢালে-ঢালে ছিল শাল, সিসু, খয়ের শিমুল, উতিস, সৌর, কাওলা, চিলাউলি, কাটুস এই সব কাঠ-অকাঠ আর নানারকম গাছগাছালির ঝোপঝাড়। দুর্গম বলে বন-বিভাগের কোন লোক কখনো নামত না এই বনে। তবে সময়-সময় কোন-কোন পথে ভোজালি হাতে পাহাড়ীরা কাঠকুটো ভেঙে আনতে কিংবা জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা ধরতে যে বনে যেত না

এমন নয়, কিন্তু তা নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামাত না। লাট-পঞ্চর-বস্তির অনেকেই বর্ষাকালে ভুট্টার চাষ করে। ভুট্টাই বলতে গেলে বস্তিওয়ালাদের বারোমাসের জলখাবার। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে ভুট্টার একটি বড় শত্রু ছিল সেদিকে। ভার্জিন-বন থেকে অন্য জন্তু বড়-একটা উঠে আসত না বস্তিতে, কিন্তু ভুট্টা ফলতে শুরু করলে, নীচের দিক থেকে পাহাড় বেয়ে ভুট্টা খেতে প্রায়ই চলে আসত গোদা-গোদা ভালুক। ভুট্টা-খেতে ঢুকেই ভালুক মট্টামট ভুট্টাগাছ ভাঙতে থাকে। অমনি সব বস্তিওয়ালা ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে তেড়ে যেত ভালুকের দিকে। আগুনকে ভালুক ভীষণ ভয় পায়। আগুনে যে গায়ের লোম হু-হু করে পুড়ে যায়, সেদিকে তাদের জ্ঞান ছিল টনটনে। এক-এক দিন কোনও বস্তিবাসী লাঠির ডগায় ন্যাকড়া বেঁধে তাতে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে দিত ভালুকের গায়ে। গায়ে লাগলে তেমন জন্তু আর বস্তিমুখো হত না কোনদিন।

বস্তির লামা শেরিংয়েরও ছিল কাঠা-চারেক ভুট্টা-খেত। তার বাড়িটা ছিল সব থেকে নীচে। খেতটা ছিল থাকবার ঘরের এক ধাপ নীচে, আর তার নীচেই ভার্জিন-বনের খাড়া পাহাড়। প্রথম দিকে তার খেতের গাছগুলো ভালভাবেই বেড়ে উঠছিল ; কারো কোন উপদ্রব ছিল না। কিন্তু যেই না তার গাছে-গাছে ভুট্টার ছড়া বেরুতে লাগল, অমনি শুরু হল রঙ-বেরঙের কতকগুলো ছোট-ছোট পাখি, আর একটা মস্ত ভালুকের আনাগোনা। পাখিগুলো আসত দিনের বেলায়, আর ভালুকটা রাত্তিরে। পাখিগুলো দু-চারটে খেত বটে, কিন্তু নষ্ট করত কম। কিন্তু ভালুকটা দাঁতে আর হাতে একটার-পর-একটা গাছই ভেঙে ফেলতে লাগল। তার মানে এক-একটা গাছের সঙ্গে পাঁচ-সাতটা ভুট্টার ছড়াও নষ্ট হত। কাজেই শেরিংয়ের কাছে ভালুকের উৎপাতটা অল্পদিনের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠল। আগুন দেখিয়েও এটাকে জব্দ করা যাচ্ছিল না। রাত নটা-দশটার দিকে বস্তিটা নিস্তব্ধ হলে ভালুকটা চলে আসত বাগানে, আগুন নিয়ে তেড়ে গেলে চট করে পালিয়ে যেত নীচে, কিন্তু আবার সেটা হানা দিত মাঝরাতে বা শেষরাতে। অন্য ভালুকগুলো কিন্তু আগুন দিয়ে তাড়ালে আর বড় ভিড়ত না সে-দিকে। কিন্তু এটা যে কেন এমন মরিয়া হয়ে বারবার ছিঁচকে চোরের মত বাগানে আসত, তার কোন কারণ বোঝা যাচ্ছিল না। শেরিং বিরক্ত হয়ে স্থির করল জানোয়ারটাকে খতম করতে হবে। কিন্তু বন্দুক ছাড়া এর মোকাবিলা করা মুশকিল।

দিনের বেলায় জন্তুটা স্রেফ নিপাত্তা হয়ে থাকে নীচের পাহাড়ে—কোথায় কে জানে। নীচের বনে পাহাড়ের ঢালে-ঢালে ঘোরাফেরা করা খুবই কঠিন, তাছাড়াও ভয় আছে অজগর কিংবা চিতার পেটে যাবার ; কোন ভালুকের খপ্পরে পড়াও আশ্চর্যের নয়, সময়-সময় ভালুক মাংসও খায়। শেরিং একদিন ফরেস্ট-গার্ড নিমু লামাকে বলল তার দুরবস্থার কথা। নিমু কালি-ঝোরায় গিয়ে রেঞ্জারবাবুকে জানাল সব ঘটনা। রেঞ্জারের একটা দোনলা বন্দুক ছিল। নিমু নিবেদন করল, সাহেব যদি তাকে বন্দুকটা আর কিছু এল জি কার্তুজ দেন, তবে সে নিজেই জানোয়ারটাকে যমের বাড়ি পাঠাতে পারে।

রেঞ্জার একজন বাঙালী। তিনি বনের জন্তু-জানোয়ার মারা পছন্দ করতেন না। তিনি নিমুর প্রস্তাবে রাজী হলেন না বটে, তবু বললেন, "শিকারী নরবু লামার কাছে দোনলা বন্দুক আছে। সে ভালুকের কথা শুনলে তাড়াতাড়ি চলে আসবে ভালুক হক, আর বাঘ হক, সে এসে মেরে দেবে। নরবু ভাল শিকারী।"

নরবুর বাড়ি শিভক রেল-স্টেশনের কাছেই। খবর পেয়ে

ভূত-পাহাড়

চিত্ররথ দত্ত

গভীর রাত্রে বহুদূর ঐ
বনের ধারে
প্রকাণ্ড চাঁদ চুপিচুপি ওঠে
ভূত-পাহাড়ে;
ঝোপ নড়েচড়ে শেয়াল পালায়,
একলা পেঁচায়
ভয়ে জড়সড় মরা ডালে বসে
ভীষণ চেঁচায়।
নির্জন এক ভাঙা বাংলোর
লতা-জঙ্গলে
দমকা বাতাসে ফিস্ ফিস্ ক'রে
ওরা কথা বলে।
হিল্‌হিলে সাপ সাবধানী চোখে
তুলে রাখে ফণা,
শুকনো পাতায় খস্ খস্ ক'রে
কার আনাগোনা!
আবার কখন হা-হা ক'রে হেসে
হায়নার পাল,
চকিতে মিলায় ছুটে নেমে এসে
পাহাড়ের ঢাল।

সে এসে দেখা করল রেঞ্জারের সঙ্গে। রেঞ্জারবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় কী করতে হবে। নরবু সেই দিনই বিকেলের দিকে পৌঁছে গেল লাটপঞ্চর-বস্তিতে। বস্তিটা নরবুর অচেনা নয়, তবে শেরিংয়ের বাড়িটা কোথায় তা তার জানা ছিল না। ফরেস্ট বাংলো পেরিয়ে হাতির মাথার মত একটা ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে কিছুটা থাক-থাক সিঁড়ির মত, আর কিছুটা উৎরাইয়ের পথে নেমে যেতে হয় শেরিংয়ের ডেরাতে। বাড়িটা বস্তির সব থেকে নীচে। শুধু তাই নয়, সব থেকে শেষের বাড়িও বটে। তার ডেরাতে বাঘ-ভালুক সবই আসতে পারে তার ভাগ্য ভাল, কেবল ভালুকই আসে। ভালুকটা কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে ওঠা-নামা করে, নরবুকে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শেরিং।

ওদিকে নিজের এলাকার বস্তিতে গুলি চলবে ভেবে রেঞ্জারবাবু একেবারে উদাসীন থাকতে পারলেন না। একটা পাহাড়ে-ট্রাকে সন্ধ্যার পরপরই তিনিও পৌঁছে গেলেন লাট-পঞ্চর ফরেস্ট-বাংলোয়। তিনি সেখানে পেঁছতেই নরবু এসে দেখা করল তার সঙ্গে। নরবু রেঞ্জারবাবুকে বোঝাল কী করে সে ভালুকটাকে মারবে। বন্দুকের নলের ডগায় একটা কাপড়ের টুকরো বেঁধে ভালুকটার কাছাকাছি গিয়ে বন্দুকটা নাড়াতে থাকবে। কাপড়ের টুকরোটা দেখতে পেলেই ভালুকটা দাঁড়িয়ে উঠে হাঁ করে তার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে দুহাত বাড়িয়ে। শুধু নলটা নাড়ালে সেটা তার নজরে না-ও

পড়তে পারে। না দাঁড়িয়ে উঠলে সেটাকে কায়দা-মত গুলিও করা যাবে না। সমস্ত প্ল্যান বুঝিয়ে দিয়ে নরবু চলে গেল শেরিংয়ের বাড়িতে। বর্ষাকাল, তায় দার্জিলিং-কালিমপঙের পাহাড়। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলেও, নরবু শেরিংয়ের বাড়ি পেঁছোবার পর আবার ঝির-ঝির করে বৃষ্টি নামল। নরবুর জন্য খাবার এল বাংলো থেকে। রাত আটটার মধ্যে ওরা খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিল। শেরিং একটা ভোজালি আর তিন সেলের টর্চ, আর নরবু তার বন্দুক-গুলি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে, একটা আধ-ভেজানো জানালার পাশে। জানালা দিয়ে শেরিংয়ের মকাই-খেতের বেশির ভাগ অংশই দেখা যাচ্ছিল না ভালমত। জ্যোৎস্নাপক্ষ হলেও গোটা আকাশ ছিল একঢালা সাদা মেঘে ঢাকা। তখনো বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। দূরে দূরে দৈত্য-দানবের প্রাসাদের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বন-জঙ্গলে ভর্তি কালো-কালো ছায়ার মত পাহাড়-পর্বত। নীচে জমাট অন্ধকারের কাঁথা মুড়ি দিয়ে ভার্জিন-বনটা পড়ে আছে। বাংলোয় বসে তখন ঝিমুচ্ছিলেন রেঞ্জারসাহেব। রাত যখন প্রায় দশটা, লাটপঞ্চরের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে রেঞ্জার সাহেবের কানে এল বন্দুকের শব্দ। শব্দ শুনে তিনি একটা টর্চ দিয়ে ফরেস্ট-গার্ড নিমুকে পাঠালেন শেরিংয়ের বাড়ির দিকে। নিমু তখন বাংলোতেই সাহেবের দেখাশোনা করছিল। কিছুটা নীচে নামতেই নিমু দেখতে পেল লামা শেরিং নিজেই তাড়াতাড়ি ওপরের দিকে উঠে আসছে। নিমুর সঙ্গে শেরিং বাংলোয় পেঁছে যা জানাল তা হচ্ছে—ভালুকটা মরেছে, কিন্তু নরবুকেও ঘায়েল করেছে শয়তানটা। নরবু পড়ে আছে ভালুকটার পাশেই।

শেরিংয়ের কথা শুনেই রেঞ্জারবাবু টর্চ হাতে ছুটলেন শেরিংয়ের বাড়ির দিকে। বৃষ্টির সময় পাহাড়ে-রাস্তায় চলা যে কেমন বিপজ্জনক, সে-কথা ভুলে গিয়ে রেঞ্জার সাহেব সিঁড়ির মত পথটায় তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলেন, আর পাঁচ-সাতটা সিঁড়ির ওপর দিয়ে স্লিপ কেটে একটু বেশি তাড়া-তাড়ি পেঁছে গেলেন একেবারে সিঁড়ির শেষের দিকের চাতালে। তবে পরনে মোটা খাকির ট্রাউজার আর লেদার-জ্যাকেট থাকায় কিছুটা কাদা মাখামাখি হলেও তাঁর শরীরে বিশেষ আঘাত লাগেনি। ভুট্টা-খেতে পেঁছে রেঞ্জারবাবু দেখতে পান খেতের একেবারে ধারে, যার পরেই নীচের দিকে নেমে গেছে ভার্জিন-বন, ভালুকটা মরে পড়ে আছে, তার মাথার কাছের মাটি লাল হয়ে আছে রক্তে। ভালুকটার তিন-চার হাতের মধ্যেই পড়ে আছে শিকারী নরবু লামা, তারও মাথার কাছের মাটি লাল। তখনো তার অল্প-অল্প জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

শেরিং তখন সব ঘটনা খুলে বলল। রাত দশটার দিকে বৃষ্টিটা যখন একটু ধরেছে, সেই সময় ভালুকটা খেতের মধ্যে ঢুকে ভুট্টা গাছ ভাঙতে শুরু করে। আস্তে-আস্তে ঘরের দরজা খুলে বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নরবু। পেছনে-পেছনে ভোজালি আর টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল শেরিং। ভালুকটা তখন মকাইগাছ ভাঙছিল। খেতের মধ্যে জলকাদা ছিল বলে তারা একটু ঘুরে আস্তে-আস্তে ভালুকটার আট-দশ হাতের মধ্যে এসে পড়ল। শেরিং তখন নরবুর প্রায় পাঁচ হাত পিছনে। নরবু বন্দুকের নলটা নাড়তে-নাড়তে ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল ভালুকের দিকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নলের ডগার কাপড়ের ফালিটা পড়ে যায় জন্তুটার নজরে। অমনি সেটা দাঁড়িয়ে উঠে থপ-থপ করে নরবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জন্তুটার মাথা তখন নরবুর মাথা থেকে দু-তিন ফুট উঁচুতে। ভালুকটা ঠিক হাঁ করেই এগিয়ে আসছিল। নরবু দুটো হাতই যতটা সম্ভব বন্দুকের পিছনের দিকে রেখে নলের মুখটা ভালুকটার হাঁ-করা মুখের কিছুটা কাছে নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে দুটো ট্রিগারই টিপে দিল। গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে শেরিং টর্চ ফেলেছিল ভালুকটার মুখে, কিন্তু তাতে শিকারীর খুব সুবিধে হয়নি। মুখের একেবারে ভিতরে নল ঢোকান সম্ভবই ছিল না, কেননা ভালুকটা এত বড় আর তার হাতগুলো এমনই লম্বা ছিল যে, সে তখন তার একটা হাত বাড়িয়ে নরবু লামার ঘাড়ে হাত রেখে মিতালি পাতাবার চেষ্টা করছিল। গুলিতে কাজ হল ঠিকই গুলি খেয়ে বিরাট এক গোরিলার মত সেই জাম্ববান একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল কিন্তু পড়তে-পড়তেও নরবুর ঘাড়ের ওপর তার ডান হাতের চারটে আঙুলের নখ বুলিয়ে দিল একবার, তাতেই নরবুর ঘাড়ের চামড়া আর কিছু মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

লোকজন ডাকাডাকি করে নরবু আর ভালুকটাকে নিয়ে যাওয়া হল বাংলোতে। সেই রাত্রিতেই নরবুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিনকোনা-বাগানের হাসপাতালে ; পরদিন সকালে সেখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হল কাছের এক মহকুমা হাসপাতালে। ভালুকটার লাজা-মুড়ো মেপে দেখা গেল লম্বায় সেটা পাক্কা ছ-ফুট। শুধু তার ছালটার ওজনই ছিল ত্রিশ সের। তাহলে গোটা জাম্ববানটার ওজন কত ছিল একবার ভেবে দ্যাখো। সকলেই বলতে লাগল, সেটা একট বুড়ো। শরীর খুব ভারী বলে তার আর জঙ্গলের কোন গাছে চড়ে ফুল-ফল খুঁটে খাবার ক্ষমতা ছিল না। তাই তার নজর ছিল মানুষের তৈরি খেত-খামারের ফসলের দিকে।

মাসখানেক বাদে নবজন্ম লাভ করে নরবু সেবারে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে।

ছবি বিমল দাস

উপন্যাস

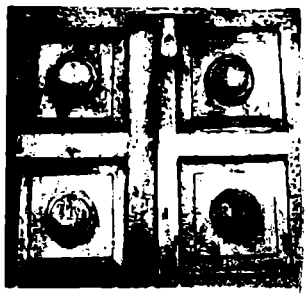

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গতকাল বিকালে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই গোগোল মায়ের কাছে শুনেছিল, ওদের বাড়ির আটতলার ডাবু আগেরদিন সকালে ইস্কুলে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। ডাবুর বয়স চোদ্দ-পনরোর কম নয়, গোগোল তাকে ডাবুদা বলে ডাকে। গোগোল সংবাদটা শুনেই মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পুলিস সারা দেশে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ডাবুদার মা-দিদিরা কাঁদছেন, বাবা সারাদিন পুলিস-অফিসারদের সঙ্গে ঘুরছেন। গোগোল নীচে গিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিল। আটতলার ফ্ল্যাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে ছ'তলার মহেশানিদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভিতরে অদ্ভুত কয়েকটা শব্দ শুনেছিল। ও জানত, মহেশানিরা সবাই দিল্লি গিয়েছেন, তাঁদের কাজের লোক চান্দা সিং ছাড়া। কিন্তু বন্ধঘরের আওয়াজ এমন সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, গোগোল ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি না দিয়ে পারেনি। এমন কী, কলিংবেলও বাজিয়েছিল। কারো সাড়া-শব্দ পায়নি। বেশ কয়েকবার ওঠানামার সময়েই গোগোল বন্ধ ঘরে নানান আওয়াজ পেয়েছিল, আর ইয়েল লকের ছিদ্র দিয়ে যেন আবছা অস্পষ্ট কিছু দেখতে পেয়েছিল। সেই সময়েই ও একটা লোককে ওপরে-নীচে ওঠানামা করতে দেখেছিল, যাকে অনেকটা ড্রাইভারের মতো দেখতে। পরে জানা গিয়েছিল, লোকটা নাকি চান্দা সিংয়ের মামা, দু ঘণ্টা ধরে মহেশানিদের ফ্ল্যাট খুঁজে পাচ্ছিল না। আজ সকালেই গোগোল জানতে পারল, ডাবুদাকে ডাকাতরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, টেলিফোন করে ডাবুদার বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। শুনে গোগোলের মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে গেল, ভাল করে ক্লাসে পড়া করতেই পারল না। আজ ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই, ও আগে গেল মহেশানিদের বন্ধ দরজায় আবার উঁকি দিতে। লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়েই মনে হল, ও ভিতরে যেন ডাবুদাকে দেখতে পেল। সত্যিই কি ? ভেবে আর-একবার উঁকি দিতে যেতেই, দরজাটা খুলে গেল, আর দুটো হাত ওকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। এখন গোগোল কোথায় কীভাবে আছে, বুঝতে পারছে না, চোখও খুলতে পারছে না. স্বপ্নের মতো ঘটনা মনে পড়ছে, মহেশানিদের ঘরের মধ্যে চান্দা সিং আর তার সেই মামা জৈল সিং ওকে হাত-পা বেঁধে, মুখ বেঁধে, ফেলে রেখেছে। গোগোলকে ওরা মিষ্টি আর দুধ খাওয়াতে চেয়েছিল, ও খায়নি, উল্টে মুখের সামনে দুধের গেলাস ধরতেই মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে গেলাস ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। ওর চিৎকার শুনেই, সেই ঘরের দরজায় ডাবুদা এসে দাঁড়িয়েছিল। ডাবুদা তা হলে এখানে, এত কাছে ? তার মানে চান্দা আর জৈল সিং সত্যি ডাকাত, তারা ডাবুদাকে এখানেই লুকিয়ে রেখেছে ? ভাবতে-ভাবতেই ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর—

॥ ১২ ॥

গোগোলের গাঢ় ঘুম আবার আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। মনে হল, ওর শরীরটা যেন ঝাঁকুনি খাচ্ছে, আর একটা গোঁগোঁ শব্দ কোথা থেকে ভেসে আসছে। হাল্কা ঘুমের ঘোরের মধ্যেই, স্বপ্নের মতো ওর চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল ডাবুদার মুখ। মহেশানিদের ফ্ল্যাটের সেই শোবার ঘরে, ওর চিৎকার শুনে ডাবুদা এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। চান্দা সিং ব্যাপারটা মোটেই ভাল চোখে দেখেনি, যে-জন্য সে আর জৈল সিং তাড়াতাড়ি গোগোলের মুখ বেঁধে দিয়ে চলে গিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ করতে ভোলেনি, ডাবুদাকেও আর দেখতে পায়নি। কিন্তু গোগোল কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, ডাবুদা মহেশানিদের ফ্ল্যাটে। ওর আবার মনে হয়েছিল, চান্দা আর জৈল সিং নিশ্চয়ই ডাকাত, ওরা ডাবুদাকে মহেশানিদের ফ্ল্যাটেই আটকে রেখেছে। গোগোলের মনে হয়েছিল, ওকে যেমন বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে গিয়ে দুটো হাত টেনে নিয়েছিল, ডাবুদাকেও নিশ্চয়ই সেইভাবেই ওরা টেনে নিয়েছিল। ওর আবার মনে পড়েছিল, ডাবুদা দরজায় এসে, চান্দা সিংয়ের কথার জবাবে কী বলেছিল। বলেছিল, "গোগোলের চিৎকার শুনে আমি ভাবলাম, তোমরা ওকে মারধোর করছ।"

তার মানে, ডাবুদা পাশের ঘর থেকে সবই শুনছিল? গোগোল তা হলে ইয়েল লকের ছিদ্র দিয়ে ভুল কিছু দেখেনি? ডাবুদা সত্যি মহেশানিদের ফ্ল্যাটে! গোগোল কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিল, ওর হাত-পা-মুখ বাঁধা, ও ডাকাতদের হাতে বন্দী, কী ঘটতে চলেছে ওর জীবনে, কিছুই জানে না। ও কেবলই ভাবছিল, ডাবুদা এখানে? ডাবুদা এখানে? অথচ এই ডাবুদার জন্য পুলিস সারা ভারতবর্ষের বড়-বড় শহরে, স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে! গোয়েন্দারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গোগোলের আরও মনে পড়েছিল, সেই রাত্রেই ডাবুদার মুক্তিপণ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিতে, পার্কসার্কাস ময়দানের দরগা রোডের কোণে ডাকাতরা আসবে। ডাকাতরা বলতে তো এই চান্দা আর জৈল সিং ছাড়া কেউ নয়।

গোগোল হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায়, বড় খাটের বিছানাটায় গড়াগড়ি দিয়ে ছটফট করেছিল। উঃ, মাত্র দু তলা ওপরেই ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে তার মা-দিদিরা কাঁদছিলেন। ডাবুদার বাবা হয়তো পুলিসের সঙ্গে তখন পার্কসার্কাস ময়দানের দরগা রোডের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর একতলা নীচেই গোগোলের বাবা-মাও না জানি কী করছিলেন। হয়তো গোগোলদের ফ্ল্যাটেও তখন পুলিস এসে গিয়েছিল। মা যে কাঁদছিলেন, গোগোলের তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। অথচ ও আর ডাবুদা একই বাড়ির ছ তলার এক ফ্ল্যাটে আটকানো।

গোগোল ওর কাপড় দিয়ে বাঁধা মুখটা বিছানায় জোরে-জোরে ঘষেছিল, যেন যেমন করে হোক, কাপড়ের বাঁধন খুলে ফেলে, চিৎকার করে জানিয়ে দেবে, ডাবুদা এখানে! আমিও এখানে! ...কিন্তু গোঙানো শব্দ ছাড়া, ওর মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দই বেরোয়নি। এত জোরে কাপড় বাঁধা ছিল, খুলতে পারা তো দূরের কথা, রীতিমতো চোয়াল ব্যথা করছিল। শুধু বাইরের লোককেই নয়, গোগোলের ইচ্ছা করছিল, ডাবুদাকেও ডাকে। তার কোন উপায়ই ছিল না। ডাবুদাকে সেই ফ্ল্যাটে দেখে, গোগোলের মনটা যেমন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল, তেমনি কিছু করতে না-পারার জন্য ও ছটফটিয়ে মরছিল।

গোগোলের যখন এইরকম অবস্থা, তখন আবার দরজা খুলে গিয়েছিল। গোগোল ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল, দরজায় ডাবুদা! গোগোল তৎক্ষণাৎ উঠে বসে ডাবুকে ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারেনি। গলা দিয়ে সেইরকম গোঙানো শব্দ বেরিয়েছিল, আর পিছমোড়া করে হাত বাঁধা, পা বাঁধা থাকার জন্য উঠতে গিয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়েছিল। ও খাটের এত ধারে চলে এসেছিল, মেঝেয় পড়ে যেত। ডাবু এসে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিল, সরিয়ে দিয়েছিল আর চোখ দিয়ে ইশারা করেছিল। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে, খুব তাড়াতাড়ি বলেছিল, "আমি যা বলব, তাই করবি। এখন চেঁচামেচি করিস না।" বলে সরে গিয়েছিল।

গোগোল দেখেছিল, দরজার সামনে চান্দা সিং দাঁড়িয়ে আছে। ডাবুদা তখন স্বাভাবিক গলায় চান্দা সিংকে শুনিয়ে বলেছিল, "শোন্ গোগোল, আমি তোর মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি, কিন্তু চেঁচামেচি করলে খুব খারাপ হবে। চেঁচামেচি করবি না তো?"

গোগোল বেশ ভাল ছেলের মতো মাথা নেড়েছিল। ডাবুদা আবার বলেছিল, "আর আমি যা বলব, সব কথা শুনবি তো?"

গোগোল বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল, শুনবে। ডাবুদা পিছন ফিরে চান্দা সিংয়ের দিকে তাকিয়েছিল। চান্দা সিং ঘাড় ঝাঁকিয়ে ডাবুদাকে যেন অনুমতি দিয়েছিল। ডাবুদা গোগোলের মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। গোগোল কয়েকবার হাঁ করে, গাল ফুলিয়ে, আড়ষ্ট চোয়াল ঠিক করে নিয়েছিল। তাকিয়েছিল ডাবুদার দিকে। ডাবুদার মুখ ওর দিকে ছিল, চান্দা সিং দেখতে পাচ্ছিল না। ডাবুদা আবার চোখের ইশারা করে করে বলেছিল, "চান্দা সিংয়ের হাত থেকে দুধের গেলাসটা ওভাবে ফেলে দিয়ে তুই খুব অন্যায় করেছিস। এখন সাড়ে নটা বাজে। এবার খেয়ে নেওয়া দরকার। খাবার দিলে খাবি তো?"

গোগোলের মনে কেমন খটকা লেগেছিল। ও কোন জবাব দেয়নি। ডাবুদা আবার চোখের ইশারা করে বলেছিল, "ঠিক আছে, চান্দা সিংয়ের হাত থেকে না খাস, আমি দিলে খাবি তো?"

গোগোলের মনের খটকা কেটে গিয়েছিল, বলেছিল, "খাব।"

ডাবুদা পিছন ফিরে, মাথা ঝাঁকিয়ে চান্দাকে ইশারা করেছিল। চান্দা দরজার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। অমনি পরে গোগোল বলে উঠেছিল, "ডাবুদা, চান্দা সিংরা ডাকাত, তোমাকে চুরি করে এখানে আটকে রেখেছে, না?"

ডাবুদা তাড়াতাড়ি চোখের ইশারা করে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, "ওসব কথা একদম বলিস না। পরে তোকে আমি সবই বলব। তুই কিছুই জিজ্ঞেস করবি না। আমি যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তার জবাব দিবি। তবে এইটুকু জেনে রাখ্‌, আমারই ভুল আর অন্যায়ের জন্য এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। ওরা আমাকে এখনো বিশ্বাস করে। সেই সুযোগটা আমাদের নিতে হবে।" এই কথার মাঝখানেই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়েই ডাবুদা বেশ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, "কিন্তু তুই কেন চাবির ফুটো দিয়ে এই ফ্ল্যাটের মধ্যে উঁকি দিয়েছিলি? তুই জানিস না পরের বন্ধ দরজার চাবির ফুটোয় উঁকি মারতে নেই?"

চান্দা সিং আগের মতোই এক হাতে খাবারের প্লেট, অন্য হাতে দুধের গেলাস নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বেশ রোখা আর সন্দেহের চোখে, একবার গোগোল, আর একবার ডাবুকে দেখছিল। ডাবুদা মোটেই চান্দার দিকে তাকাচ্ছিল না। গোগোল বলেছিল, "সে-কথা তো আমি চান্দা সিংকে সবই বলেছি।"

ডাবুদা বলেছিল, "বলেছিস বেশ করেছিস। যেমন উঁকি দিয়েছিলি, এবার তার ফল ভোগ কর।" বলে চান্দার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট মুচকে হেসেছিল, আর দুধের গেলাসটা নিজের হাতে নিয়েছিল।

গোগোলের মনে আবার খটকা লেগেছিল। ও যেন ডাবুদার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে যখন চান্দার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, মনে হয়েছিল, সে চান্দারই বন্ধু। গোগোলকে ঠকাচ্ছে। চান্দাও যেন গোঁফের ফাঁকে হেসেছিল। গোগোল বলে উঠেছিল, "এখন তা হলে আমার কী হবে?"

ডাবুদা বলেছিল, "কী আর হবে, এখন আর তোকে ছাড়া যাবে না।" বলে, অদ্ভুতভাবে মুখটা পাশ ফিরিয়ে, আবার গোগোলকে চোখের ইশারা করেছিল। বলেছিল, "ঠিকমতো কাজ হাসিল হলেই তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই না চান্দা সিং?" বলে চান্দার দিকে তাকিয়েছিল।

চান্দা বলেছিল, "হ্যাঁ তাই, তবে গোগোল যদি ঠিক-ঠিক কথা শোনে। ওকে জিজ্ঞেস করো তো, ও তোমার কথা কী শুনেছে?"

ডাবুদা বলেছিল, "বল্‌ গোগোল, কী শুনেছিস্‌?"

গোগোল বলেছিল, "সবাই যা শুনেছে, আমিও তাই শুনেছি। তোমাকে নাকি ডাকাতরা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে, পঞ্চাশ-হাজার টাকা পেলে ছেড়ে দেবে।"

চান্দা জিজ্ঞেস করেছিল, "এ-কথা তুমি কার কাছে শুনেছিলে?"

গোগোল হনুমন্তিয়াজীর নাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করেনি। বলেছিল, "বাবা যখন মাকে বলছিলেন, তখন শুনেছি।"

চান্দা জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার বাবা কোথা থেকে, কার কাছ থেকে শুনেছিল?"

গোগোল বলেছিল, "তা আমি জানব কেমন করে?"

ডাবুদাও চান্দাকে বলেছিল, "এ-কথা গোগোলকে জিজ্ঞেস করার কোন মানে হয় না। ও কী করে জানবে, ওর বাবা কোথা থেকে শুনেছেন। তুমি খাবারের প্লেটটা রেখে বাইরে চলে যাও, আমি গোগোলকে খাইয়ে দিচ্ছি।"

চান্দা খাবারের প্লেটটা খাটের বিছানার ওপর রেখে বলেছিল, "কিন্তু খবরদার ডাবু, গোগোলের হাতে-পায়ের দড়ি যেন খুলে দিও না। ও তা হলে কী করবে, কিছু ঠিক নেই।"

ডাবুদা বলেছিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি চান্দা সিং, আমি তাই কখনো করি? তুমি তোমার কাজ করো গিয়ে।"

চান্দা চলে যেতে যেতে আবার থেমে বলেছিল, "খুব হুঁশিয়ার। গোগোল চেঁচালে একদম ওর গলা টিপে দেবে।"

ডাবুদা বলেছিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তোমাকে বলতে হবে না। গোগোল তো কথাই দিয়েছে, ও চেঁচামেচি করবে না।"

চান্দা বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজাটা খোলাই রেখেছিল। গোগোল ডাবুদার দিকে তাকিয়ে চুপিচুপি গলায় বলেছিল, "ডাবুদা; আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওরা যদি তোমাকে চুরি করে লুকিয়েই রেখে থাকবে, তবে তুমি ওদের সঙ্গে এরকম বন্ধুর মতো কথা বলছ কেন?"

ডাবুদা একবার পিছন ফিরে দেখে, খাবারের প্লেট থেকে সন্দেশের টুকরো তুলে গোগোলের মুখে পুরে দিতে দিতে বলেছিল, "তখন বললাম না, আমারই ভুল আর অন্যায়ের জন্য এরকম ঘটনা ঘটেছে।"

গোগোল নিশ্চিন্তে সন্দেশ খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করেছিল, "ভুল আর অন্যায়টা কী?"

ডাবুদা বলেছিল, "ওদের বিশ্বাস করাটাই আমার ভুল আর অন্যায় হয়েছিল। নে, দুধে চুমুক দে।"

গোগোল দুধের গেলাসে চুমুক দিয়েছিল। চুমুক দিয়েই মনে হয়েছিল, দুধের মধ্যে চকোলেট বা সেই জাতীয় কোন গন্ধ রয়েছে। কিন্তু ওটা তো মিলক চকোলেট ছিল না? রঙটা তো সাদাই ছিল? ও জিজ্ঞেস করেছিল, "ডাবুদা, দুধের মধ্যে চকোলেটের মতো কিসের একটা গন্ধ রয়েছে।"

ডাবুদা বলেছিল, "থাকতে পারে, বোধ হয় এই গেলাসেই আমি চকোলেট গুলে খেয়েছিলাম।"

গোগোলেরও দুধ নিয়ে আর তেমন কিছু মনে হয়নি, বরং ডাবুদার আগের কথাটাই ওর মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "ওদের বিশ্বাস করা মানে কী ডাবুদা? ওরা কি তা হলে তোমাকে চুরি করেনি?"

গোগোলকে খাওয়াতে-খাওয়াতে ডাবুদা যেন কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। বলেছিল, "চুরি? এখন বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা চুরিই। কিন্তু সে-সব অনেক কথা গোগোল, পরে তোকে আমি সব বলব। এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিস না।" ফিসফিস করে কথাগুলো বলে, ডাবু আবার পিছন ফিরে খোলা জানালার

দিকে দেখেছিল। মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, "চান্দা সিং হয়তো দরজার আড়াল থেকে লুকিয়ে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে পারে। খুব সাবধান। একবার যদি ওরা আমাকে অবিশ্বাস করে, তা হলে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে।"

গোগোল অবাক হয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি তা হলে কোনো প্ল্যান করেছ?"

ডাবুদা বলেছিল, "করেছি। দাঁড়া তো, দরজার আড়ালে চান্দা সিং আছে কি না দেখে আসি।" বলে সে পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গিয়েছিল। আস্তে-আস্তে মুখ বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখেই, আবার ফিরে এসেছিল।

গোগোল ভয় পাচ্ছিল। ডাবুদা নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিল, "না, চান্দা সিং বাইরের ঘরে, টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করেছিল, "আর জৈল সিং কী করছে?"

ডাবুদা বলেছিল, "সে বাইরে গেছে সব হালচাল জানতে আর দেখতে।"

গোগোল খোলা দরজার দিকে একবার দেখে, রাস্তার দিকের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "ডাবুদা, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে, চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যায় না, আমাদের ওরা এখানে আটকে রেখেছে?"

ডাবুদার চোখ দুটো ভয়ে গোল হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, "তা হলে তোকে আর আমাকে বাঁচতে হবে না। এরা খুব সাংঘাতিক লোক! এরা করতে পারে না, এমন কাজ নেই।"

খাবার খাওয়া শেষ হতে হতেই, গোগোলের মনে হচ্ছিল ওর খুব ঘুম পাচ্ছে। ও হাই তুলতে আরম্ভ করেছিল। ডাবুদার কথা শুনে গোগোল কিছু বলতে যাচ্ছিল। সেই সময়েই চান্দা এসে ঘরে ঢুকেছিল, বলেছিল, "কী হল ডাবু, এখনো খাওয়া হল না?"

ডাবুদা গোগোলের মুখের সামনে দুধের গেলাসটা ধরে বলেছিল, "নে গোগোল, এই দুধটুকু বাকি আছে, খেয়ে নে।"

গোগোল দুধটুকু সব চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, "ডাবুদা, আমাকে একটু জল দাও।"

চান্দা সিং নিজেই তাড়াতাড়ি জল এনে দিয়েছিল। ডাবুদার হাত থেকে জলের গেলাসে চুমুক দিতে-দিতেই গোগোলের মনে হয়েছিল, ওর চোখ জুড়ে নেমে আসছে ঘুমের রাজ্য। কোন-রকমে জল খেয়েই ও গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বলেছিল, "ডাবুদা, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

ডাবুদা বলেছিল, "তুই ঘুমো, আমি আসছি।"

গোগোল গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল।

গোগোলের স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল, শুনতে পেল, ওর কানের কাছে মুখ এনে ডাবুদা ফিসফিস করে ডাকছে আর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। গোগোলের ঘুম আর স্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাল। দেখল মাথার ওপরে কালো আকাশ, আকাশে অনেক তারা ঝিকমিক করছে। তারপরেই ও অন্ধকারে ডাবুদার মুখটা আবছা দেখতে পেল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ডাবুদা, আমরা এখন কোথায়?"

ডাবুদা ফিসফিস করে বলল, "আমরা এখন একটা খোলা ট্রাকে যাচ্ছি, বম্বে রোডের ওপর দিয়ে। যা বলছি, ভাল করে শোন্। সময় বেশি হাতে নেই।" (ক্রমশ) ছবি সমীর সরকার

গাবলু

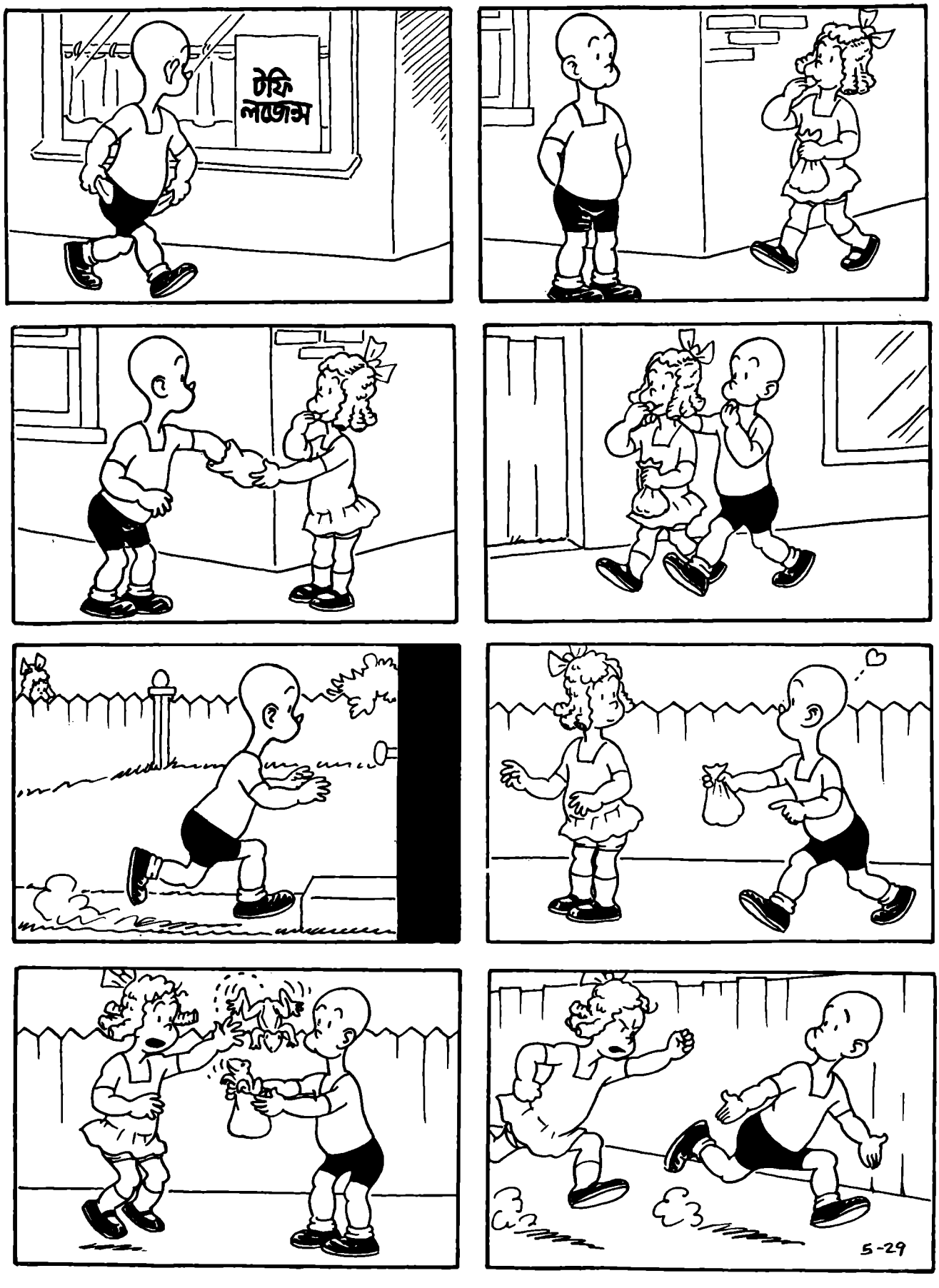

পিনোশিয়োর নামে পার্ক

বিকাশ বসু

বিখ্যাত লেখকের নামে তো পার্ক হয়ই—যেমন আমাদের উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকানন। রবীন্দ্রনাথের নামে পার্কটির নাম রাখা হয়েছে। তাই বলে গল্পের একটি ছেলের নামে গোটা একটা পার্ক? হাঁ, তাও আছে ইটালিতে। অবশ্য এই ছেলেটি খুবই বিখ্যাত, দুনিয়ার সব দেশেই ছেলেটির বন্ধু ছড়িয়ে রয়েছে। কেননা, যে-কেউ 'পিনোশিয়ো' নামের সেই আশ্চর্য বইটি একবার পড়েছে, সে-ই ছেলেটির চিরকালের বন্ধু হয়ে গেছে। এমন বই আর হয় না, যে-ছেলেটিকে নিয়ে গল্প, সেই ছেলেটির মত দুষ্টু অথচ ভাল ছেলেও বোধ হয় আর হয় না। এজন্যে বড়দের মধ্যেও পিনোশিয়োর বন্ধু অনেক। তাঁরা ছেলেবেলায় হয়তো বইটা পড়েছেন, কিন্তু এখনো ভুলতে পারেন না তাঁদের ছেলে-বেলার সেই বন্ধুকে।

আসলে ভুলতে পারা যায় না এমন সেই বই। দুনিয়ার প্রায় সব বড় বড় ভাষায় এ-বইয়ের অনুবাদ হয়ে গেছে, একবার নয়, বার-বার। তোমরাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ পড়েছ ইংরিজিতে অথবা বাংলায়। তবু যারা পিনোশিয়োকে চেন না, তাদের একটু চিনিয়ে দিই।

বুড়ো জেপেট্টো বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে তৈরি করল এক কাঠের পুতুল, যে লাফায়, নাচে, আরও-সব অঙ্গভঙ্গি করে। বুড়ো তার নাম দিল 'পিনোশিয়ো'। জেপেট্টোর অনেক আশা, পিনোশিয়ো বড় হয়ে তার দুঃখ দূর করবে। কিন্তু পিনোশিয়ো যা দুষ্টু, বাপের কথাই শোনে না, প্রায়ই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরের দেওয়ালে থাকে ঝিঁঝি পোকা, তার চোখেও পড়ল ব্যাপারটা। রোজ লক্ষ করে করে একদিন সে পিনোশিয়োকে সাবধান করল, এমন কোরো না, বিপদে পড়বে।

রোজকার মত সেদিনও জেপেট্টো কাজে বেরিয়েছিল, ফিরে দেখে, ছেলে তার দুটো পা-ই পুড়িয়ে বসে আছে। জেপেট্টো বলল, কাঠের পা বই তো নয়, ভাবনা কী, আবার দুটো তৈরি করে দেব, কিন্তু পা পুড়ল কী করে? পিনোশিয়ো কাঁদতে-কাঁদতে বলল, বড্ড শীত করছিল, তাই আমি পা দুখানা উনুনে একটু তাতিয়ে নিচ্ছিলুম, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি, ধোঁয়ায় ঘুম না ভাঙলে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম।

দারুণ মজা না? এমন কত মজা যে ছড়িয়ে আছে সারা বইটাতে। কাঠের পা কেউ উনুনে দেয়? কিন্তু পিনোশিয়ো এমনি মজার ছেলে। তারপর শোনো। অন্য ছেলেদের দেখাদেখি পিনোশিয়ো বায়না ধরল, সেও ইস্কুলে পড়বে। গরিব জেপেট্টো পয়সা পাবে কোথায়, ছেলের বই কিনতে তাকে নিজের একমাত্র কোট বিক্রি করে দিতে হল। এদিকে ইস্কুলে যাবে কী, পিনোশিয়োর পড়ায় একটুও মন নেই। একদিন সে বই-টই সব বিক্রি করে দিয়ে একটা টিকিট কিনে পুতুল নাচের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

সেখানেও বিপদ। পুতুল-নাচের পুতুলরা তাকে দেখতে পেয়ে বলল, আরে আরে, তুমি দর্শকদের আসনে বসে কেন, তুমি তো পুতুল-সমাজের লোক, এইখানে স্টেজের ওপর আমাদের মাঝখানে চলে এসো।

তারপর যা হবার তাই, দারুণ হৈ হট্টগোল, পুতুল নাচ-টাচ সব পণ্ড। মালিক তো রেগে আগুন। পিনোশিয়োকে সে টুকরো-টুকরো করে উনুনে দিতে চায়। কাঠের পুতুল বই তো সে আর কিছু নয়, উনুনে দেবার কথায় ভয়ে তার বুক উড়ে গেল। সে মালিকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে মাপ চেয়ে নিল। জেপেট্টোর কোট বিক্রি থেকে শুরু করে তার নিজের বই বিক্রির কথা আগাগোড়া সব স্বীকার করল। মালিক লোকটাকে দেখতে বিচ্ছিরি হলে কী হবে, তার মনটা ছিল ভাল, সে পিনোশিয়োকে শুধু যে মাপ করল তা নয়, নতুন করে বই কেনার জন্যে তাকে পাঁচ-পাঁচটা মোহরও দিল।

কিন্তু অত সহজে কি পিনোশিয়োর সুমতি হয়? আর পথে ঘাটে বন্ধু-সাজা দুষ্টু লোকের কি অভাব আছে? বাড়ি ফেরার পথে শেয়াল পণ্ডিত আর পুষি বেড়ালের সঙ্গে তার দেখা। তারা বলল, ঐ মোহরগুলো দিয়ে আব্বার বই কিনবে বুঝি? তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন, ওগুলো দিয়ে তুমি 'মজার দেশে' চলে যাও, সেখানে পড়াশোনা কাজকম্ম কিছু করতে হয় না। তারপর মোহরগুলো হাতিয়ে নিয়ে তারা বলল, এবার চোখ বুজে দশ গোনো, তাহলেই মজার দেশে পৌঁছে যাবে। কিন্তু দশ গোনার আগেই পিনোশিয়ো মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে শেয়াল আর বেড়াল সেখান থেকে সরে পড়ল।

ভাগ্যিস নীলপরী ছিল আর খরগোশরা তাকে দেখতে পেয়েছিল, নইলে সে মরেই যেত। খরগোশরা তাকে ধরাধরি করে নীলপরীর প্রাসাদে নিয়ে এল। সেখানে ডাক্তার দাঁড়কাক আর নার্স ঝিঁঝিপোকা তাকে বাঁচিয়ে তুলল। তারপর সে সেরেসুরে উঠলে নীলপরী তাকে কাছে ডেকে তার সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস

করল। সে মিথ্যে করে বলল, বনের মধ্যে পড়ে গিয়ে মোহর হারিয়েছে, মাথায় চোট পেয়েছে, এই সব। সে একটি-একটি করে মিথ্যে বলে, আর একটু-একটু করে তার লম্বা নাক আরও লম্বা হয়ে যায়। তার নাক বাড়ছে তো বাড়ছেই। পিনোশিয়ো তো ভয়ে একেবারে হিম হয়ে গেল। তারপর যেই সে সত্যি কথা বলেছে, অমনি নীলপরী চড়াইদের ডাক দিল। তারা এসে পিনোশিয়োর লম্বা নাকের বাড়তি অংশটুকু ঠুকরে বাদ দিয়ে দিল।

নীলপরী তাকে অনেক আদর করে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার বাড়ি ফেরা হল কই? পথে এক আঙুর-খেতে আঙুর চুরি করতে গিয়ে সে চাষীর ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। চাষী তার গলায় শেকল বেঁধে কুকুরের ঘরে রেখে দিল। রাত্রে যখন শেয়াল এল মুর্গি চুরি করতে, শেকলবাঁধা পিনোশিয়ো তখন এমনি চেঁচাল যে কুকুরও হার মেনে যায়। শেয়াল তো পালিয়ে বাঁচে। পরের দিন ভোর না হতে চাষী খুশি হয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দিল।

পিনোশিয়ো মনে-মনে বলল, অনেক শিক্ষা হয়েছে, এবার সোজা বাড়ি। হয়তো এবার সে সত্যিই ফিরে যেত বুড়ো জেপেট্টোর কাছে। সে-বেচারী হাপিত্যেশ করে বসে আছে ছেলে কখন বাড়ি ফিরবে। কিন্তু এমনি কপাল, এবারই সে পথ ভুল করল। পথ ভুল করে সে দারুণ ভয় পেয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। সেই ডাক শুনে কোত্থেকে নেমে এল মস্ত বড় এক পায়রা। সে বলল, বাড়ি যাবে কী, জেপেট্টো তো এখন বাড়ি নেই, সে তো এখন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার খোঁজে জেপেট্টো নাকি নৌকো নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে।

পিনোশিয়ো বলল, নিয়ে চলো আমাকে, শিগগির সেখানে নিয়ে চলো। ঈগল পাখির ডবল আকারের সেই পায়রার কাছে কাঠের পুতুল পিনোশিয়ো তো খেলনা, সে তাকে ঠোঁটে করে নিয়ে চলল সমুদ্রের ওপর দিয়ে। জেপেট্টোর নৌকোর দেখা মিলল, বাবার দেখা পেয়ে পিনোশিয়ো আনন্দে উদ্বেল, ঠিক সেই সময় জেপেট্টোর নৌকো গেল উল্টে, বুড়ো লোকটা সমুদ্রের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। পিনোশিয়োও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু জেপেট্টোকে খুঁজে পেল না, শেষে অনেক সাঁতরে সে উঠল এসে এক দ্বীপে।

সেখানে তার দেখা হল আবার সেই নীলপরীর সঙ্গে। এবার নীলপরী তাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে মানুষ করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। পিনোশিয়োও ভাল ছেলে হয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার এক দুর্ঘটনা। তার জীবনে দুর্ঘটনা লেগেই আছে। স্কুলের একটি ছেলেকে আর-একটি ছেলে একদিন মোটা বই দিয়ে এমনি মারল যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সকলে ফেলে চলে গেলেও পিনোশিয়ো দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে লাগল। পুলিসের লোকজন ছুটে এল, সঙ্গে তাদের বাঘা কুকুর। পিনোশিয়োকেই তারা অপরাধী ধরে নিল। পুলিসের হাত এড়াতে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, পেছনে মস্ত বাঘা কুকুর। আবার এক মজা। কুকুরটা সাঁতার জানত না, জলে ডুবে মরে আর কী। পিনোশিয়ো তাকে ডাঙায় তুলে দিয়ে আবার সাঁতরে চলল।

এদিকে এক সাগর-দানো জাল ফেলে তার খাবার সংগ্রহ করছিল। পিনোশিয়ো সেই জালে ধরা পড়ল। সাগর-দানো চিরকাল খাদ্য হিসেবে পেয়েছে মাছ, হাঙর, কুমির এই সব। এমন আজব খাবার এই প্রথম পেল সে। সে ভাবল এটাকে ফ্রাই করলে জমবে ভাল। সে পিনোশিয়োর সারা গায়ে বেশ করে চর্বি মাখিয়ে উনুনে কড়া চাপাতে গেছে, এমন সময় মস্ত এক বাঘা কুকুর চর্বির গন্ধে সেখানে এসে হাজির। এ কুকুর আর কেউ নয়, সেই সাঁতার-না-জানা পুলিস-কুকুর, পিনোশিয়ো যাকে জল থেকে বাঁচিয়েছিল। বাঘা তো তাকে মুখে করে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে এল।

সারাদিনে পুলিস, সাগর-দানো, কত কী ঘটনা ঘটে গেল। এবার দিনের শেষে তার নীলপরীর কথা মনে পড়ে গেল, সে হয়তো তার জন্যে খুব ভাবছে। সে আর একটুও দেরি না করে ছুটল নীলপরীর প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদের রক্ষী শামুক, তার তো আর হাত নেই, সে শুঁড়ের ওপর বাতি জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে-আস্তে দরজা খুলে দিল। এই সামান্য কাজে তার বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লেগে গেল। কিন্তু পিনোশিয়ো তখন দারুণ ক্লান্ত। দাঁড়িয়ে থাকতে না-পেরে সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল, তখন সে দেখল, নীলপরী হাসিমুখে তার খাটের পাশে বসে আছে। নীলপরী তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছে। সে এত ভালো ছেলে হয়ে গেল যে, নীলপরী খুশি হয়ে তাকে সত্যি-সত্যি 'মানুষের ছেলে' করে দিতে চাইল। তার দ্বিতীয় জন্মের জন্যে একটা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হল। ২০০ জন অতিথি উপস্থিত থাকবে সেই অনুষ্ঠানে।

নেমন্তন্নর চিঠি হাতে পিনোশিয়ো নিজেই গিয়েছিল এক বন্ধুর বাড়ি। আবার এক বিপদ। বন্ধুর কাছে সে জানতে পারল, সেই রাত্রেই নাকি একটা গাড়ি 'মজার দেশে' পাড়ি দিচ্ছে। সে আর থাকতে পারল না, কোথায় রইল নীলপরীর স্নেহ-মমতা, কোথায় রইল তার দ্বিতীয় জন্মের অনুষ্ঠান, সেই রাত্রেই সে বেরিয়ে পড়ল বারো-গাধায়-টানা গাড়িতে মজার দেশের উদ্দেশে। মজার দেশে অবশ্য খুবই মজা হল, কিন্তু পরের দিনই সকালে দেখা গেল, পিনোশিয়ো, তার সেই বন্ধু এবং বাদবাকী সমস্ত ছেলেরা গাধা হয়ে গেছে। গাধা পিনোশিয়োকে এক সার্কাস দলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হল। সেখানে অনেকদিন ধরে গাধার খেলা দেখিয়ে একদিন সে পা ভেঙে বসল।

এমন খোঁড়া গাধা দিয়ে সার্কাস দলের কী হবে? সার্কাসের মালিক তার গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিল। তার গলায় বাঁধা দড়িটি কিন্তু ছাড়ল না, গাধাটা মারা গেলে তার চামড়াটা কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু দড়িতে টান দিতে উঠে এল কে? উঠে এল এক কাঠের পুতুল—অর্থাৎ সেই পিনোশিয়ো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে পিনোশিয়ো সার্কাসের মালিককে বুঝিয়ে বলল, এর জন্যে সে নিজে মোটেই দায়ী নয়। সমুদ্রের মাছে তার গাধার দেহ খেয়ে ফেলেছে, তাই সে তার আসল দেহ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এতেও মালিকের রাগ পড়ল না, সে পিনোশিয়োকে ধরে বাজারে বিক্রি করে দেবে। তাই শুনে ভয়ানক ভয়ে পিনোশিয়ো আবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সাঁতার, সাঁতার, শুধু সাঁতার। কোথায় যাবে সে জানে না, সে সাঁতার কেটে চলেছে। কোথাও তাকে যেতে হল না, বিরাট এক হাঙর তাকে পেটের মধ্যে পুরে ফেলল।

হাঙরের পেটের মধ্যে সে কী বিদঘুটে অন্ধকার। পিনোশিয়ো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই আশার আলো দেখা গেল। মোমবাতি জ্বালিয়ে ঠুক-ঠুক করে যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে কে। কে সে? সে-ই তার সবচেয়ে প্রিয়জন, বুড়ো জেপেট্টো। সেই যে পিনোশিয়োকে খুঁজতে গিয়ে সমুদ্রে তার নৌকো উল্টে গিয়েছিল, মনে আছে তো?

এখন তারা দুজনেই একই হাঙরের পেটের সুড়ঙ্গে। দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল যেদিকটায় হাঙরের মুখ সেই দিকে। তারপর হাঙরটা যেই একবার হাঁ করেছে অমনি তারা সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুক্তি। দুজনে প্রাণ-পণে সাঁতরে চলল। কিন্তু কূল কোথায়, কত দূরে? ভাগ্যিস

এক টুনি-মাছের সঙ্গে দেখা, সে তাদের পিঠে করে ডাঙায় পৌঁছে দিল।

তারপর পিনোশিয়ো একদম ভাল হয়ে গেল, জেপেট্টোকে ছেড়ে সে আর কোথাও যায় না। একদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল সেই নীলপরীকে। নীলপরী যেন তাকে বলছে, পিনোশিয়ো, তোমার মন একদম ভাল হয়ে গেছে দেখছি। পরের দিন সে ঘুম-ভাঙা চোখে দেখল—সে 'মানুষের ছেলে' হয়ে গেছে, আর তার খাটের পাশে একটা প্রাণহীন কাঠের পুতুল।

গল্পটা দারুণ নয় কি? আর পিনোশিয়ো ছেলেটি কী মজার! এমন ছেলে কি মন থেকে মুছে যাবার? বইয়ের পাতায় মানুষের মনে তো সে ছিলই, এখন কয়েক বছর হল তার একটা নতুন ঠিকানা হয়েছে—'পিনোশিয়ো পার্ক' পেশিয়া শহর, ইটালি।

কী মজা দ্যাখো, লেখকের নামে পার্ক হল না, হল তার তৈরি একটি চরিত্রের নামে। হবে নাই বা কেন, লেখকের চেয়ে যে তার তৈরি এই কাঠের পুতুলটি অনেক অনেক বেশি বিখ্যাত। আসলে পিনোশিয়োর লেখকের নাম কজনই বা জানে।

লেখক কে? ও, তাও বলিনি বুঝি? বইয়ের মলাটে লেখা থাকে কার্লো কলোডি, এই নাম। কিন্তু ভদ্রলোকের ওটা আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আসলে তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সবাসী এক সাংবাদিক। নামের প্রথম অংশটি (কার্লো) রেখে তিনি দ্বিতীয় অংশটুকু পালটে দিয়েছিলেন, কেন কে জানে। তাই কার্লো কলোডি নামেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। কিন্তু খুব বিখ্যাত হয়ে গেলে যা হয়, ছদ্মনাম তো থাকেই, আসল নামটাকেও অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনা হয়। পিনোশিয়োর মত বইয়ের লেখকের আসল নামটা জানা যাবে না তাও কখনো হয়?

কার্লো কলোডির আসল নাম কার্লো লোরেনজিনি। জন্মে-ছিলেন ১৮২৬ সালে, মারা যান ১৮৯০ সালে। কলোডি নামেই ছোটদের জন্যে লিখেছিলেন আরও কিছু গল্প। কিন্তু পিনো-শিয়োর মত আর হল না। পিনোশিয়ো বেরিয়েছিল ১৮৮১ সালে, আর তার ঠিক ৭৫ বছর পরে তার নামের এই পার্কটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন পেশিয়া শহরের মেয়র। এই ৭৫ বছর সে জীবন্ত ছিল শুধু মানুষের মনে। এখন থেকে সে বেঁচে থাকবে তার নামের এই পার্কেও।

প্রথমটায় মনে হতে পারে, এমনও হয়? গল্পের একটি ছেলেকে নিয়ে একটা দেশের লোক এমনি মেতে উঠতে পারে যে, তার নামে একটা পার্ক বানিয়ে ফেলতে পারে? তাও আবার ছেলেটি গল্পের মধ্যে আগাগোড়া কাঠের পুতুল হয়ে রইল, শুধু গল্পের একবারে শেষে এসে জীবন্ত মানুষ হয়ে গেল।

কিন্তু ভেবে দেখ, এমন ছেলে আর হয় না—এমন দারুণ দুষ্টু আর এমন দারুণ ভাল। দুনিয়ার লোকে তাকে ভালবাসে—অন্তত ৬৮টি ভাষায় পিনোশিয়োর কাহিনীর অনুবাদ হয়ে গেছে।

ওর নিজের দেশের লোক তো ওকে ভালবাসবেই—ওর নিজের দেশের ভাষায় (ইতালিয়ান) '৩৪ বার নতুন করে নতুনভাবে ঐ একই বই ছাপা হয়েছে। শুধু কি তাই, ছবির জাদুকর ওয়াল্ট ডিজনি ওকে নিয়ে যা একখানা ছবি তুলেছেন, তা বলার নয়, শুধু দেখার।

এবার তার নিজের নামের ধরনের পার্কে কী দারুণভাবে সে বেঁচে থাকবে শোনো। প্রথমত সেখানে ১৬ ফুট উঁচু তার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে সেই নীলপরীর সঙ্গে, যে নীলপরীর কাছে মিথ্যে কথা বলার অপরাধে তার নাক বেড়েই গিয়েছিল। নীল-পরীকে তার চুলের রঙ দেখেই চেনা যায় আর পিনোশিয়োকে তো চেনা যায়ই, সে কাঠের পুতুল, তার ভাবভঙ্গিই আলাদা।

পার্কের মাঝ-বরাবর যে চত্বর সেখানে দেওয়াল-জোড়া মোজেকের কাজ—পিনোশিয়োর জীবনের সব রোমাঞ্চকর ঘটনা তাতে পরপর আঁকা।

এ ছাড়া গল্পের প্রধান-প্রধান যে-সব চরিত্র, তাদের প্রত্যেকের মূর্তি এমনভাবে ছড়ানো রয়েছে যে, ছেলেরা তাদের সঙ্গে বেশ খেলা জমিয়ে তুলতে পারে।

পার্কের চারিদিকে স্থানীয় লোকেরা দোকান দিয়েছে। যারা এই পার্কে বেড়াতে আসে, তারা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু কেনা-কাটা করে। এখানে বিক্রি হয় পুতুল, ছবি, বই, এই সব—সবই পিনোশিয়ো সম্বন্ধে।

পার্কে ঢোকার মুখেই রয়েছে 'রেড ক্র্যাব ইন'। খাবার দোকান। সেখানে যে-সব খাবার পাওয়া যায় সবই পিনোশিয়োর কথা আর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

যাদের আসল বইটা পড়া আছে তারা তো মজা পায়ই, যাদের পড়া নেই তাদেরও এখানে এলে আসল বইটা পড়তে ইচ্ছে করে।

বিশ্ব ফুটবলের নানা খবর

মুকুল দত্ত

গত মাসে বিশ্বকাপ-ফুটবলের লেখার সঙ্গে তোমরা টিপ ও ট্যাপ-এর ছবি দেখেছ। ১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানিতে যখন বিশ্বকাপের খেলা হয়, তখন টিপ ও ট্যাপ ছিল প্রতিযোগিতার প্রতীক। বড়-বড় সব প্রতিযোগিতারই একটা প্রতীক থাকে। ইংরেজিতে বলা হয় ম্যাসকট।

কাগজে নিশ্চয় দেখেছ ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকসের জন্য কেমন মজার একটা ভালুকের ছবি ম্যাসকট হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬-র বিশ্ব-ফুটবলের ম্যাসকট ছিল ফুটবলের উপর দাঁড়ানো একটি পুতুল-ফুটবলার। এবার আর্জেন্টিনায় যে একাদশ বিশ্বকাপের খেলা আরম্ভ হচ্ছে পয়লা জুন থেকে, তার ম্যাসকট হয়েছে বল-পায়ে খেলার জন্য প্রস্তুত এক বালক।

প্রতীক-চিহ্ন এক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার। ক্লাবের ক্ষেত্রেও দেখনি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতীক? পাল-তোলা নৌকা আর হাতে-ধরা মশাল? জানো কি যে-অ্যাসোসিয়েশন এই বিশ্ব-ফুটবল চালায় সেই 'ফিফা'র প্রতীক কী? পাশা-পাশি আঁকা পৃথিবীর দুই গোলার্ধ। এরও একটা তাৎপর্য আছে। যেমন যে দেশে খেলা হয় সেই দেশের নানা সামগ্রীর উপর থাকে ওই প্রতীক-চিহ্ন। গেঞ্জি, জামা, নেকটাই, ছাতা খেলনা, কলম, সাবান-কেস, পাউডারের কৌটো, টেলিভিশন সেট রেডিও প্রভৃতি দ্রব্যের উপরই বেশি। স্মারক হিসাবে ওইগুলি সংগ্রহ করেন দেশ-বিদেশের মানুষ। খেলাধুলোয় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অবশ্য অনেক পিছিয়ে আছি। তবু কলকাতায় ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সময়-কার 'ইনট্যাব—৭৫' ছাপ-মারা স্মারক হয়তো কারো-কারো কাছে আছে। তাৎপর্য আছে বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পতাকায় ও প্রতীকে। নিশ্চয়ই দেখেছ এক সঙ্গে গাঁথা পাঁচটি বলয়। পাঁচটি বলয় কেন? না, পাঁচ মহাদেশের প্রতীক—এক-সঙ্গে জোড়া লেগে আছে।

ফিফার প্রতীক দুই গোলার্ধের এক দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অপরদিকে ইউরোপ ও পৃথিবীর বাকি অঞ্চল। দ্যাখো, বিশ্বকাপের খেলায় জোর লড়াইও হয় এই দুই অঞ্চলে। গত মাসেই তো এই আনন্দমেলায় বিজয়ীর তালিকায় দেখেছ, যে দশবার প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে তার মধ্যে পাঁচবার জিতেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ, পাঁচবার ইউরোপের। দুই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে জোর লড়াই হয়েছে মেক্সিকোয় ১৯৭০-এর প্রতিযোগিতায়। কোয়ার্টার ফাইনালের ৮টি দলের মধ্যে ৪টি করে ছিল দুই গোলার্ধের। সেমি-ফাইনালেও খেলেছিল দুই অঞ্চলের ৪টি দেশ। ফাইনালে একদিকে ছিল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, অপরদিকে ছিল ইউরোপের ইতালি। জানই তো, ওই প্রতিযোগিতা থেকেই ব্রাজিল বিজয়ীর পুরস্কার সোনার পরীটি চিরদিনের জন্য নিয়ে যায়, আর সারা ব্রাজিল আনন্দে পাগল হয়ে ওঠে, খেলোয়াড়রা হয়ে ওঠে দেবতা। পেলে, কারলোস,

---

কার "জেনারেল নলেজ" বেশী? ঝন্টুর না মন্টুর?

চিত্র—পরাগ রায়
বয়স—১২ বছর

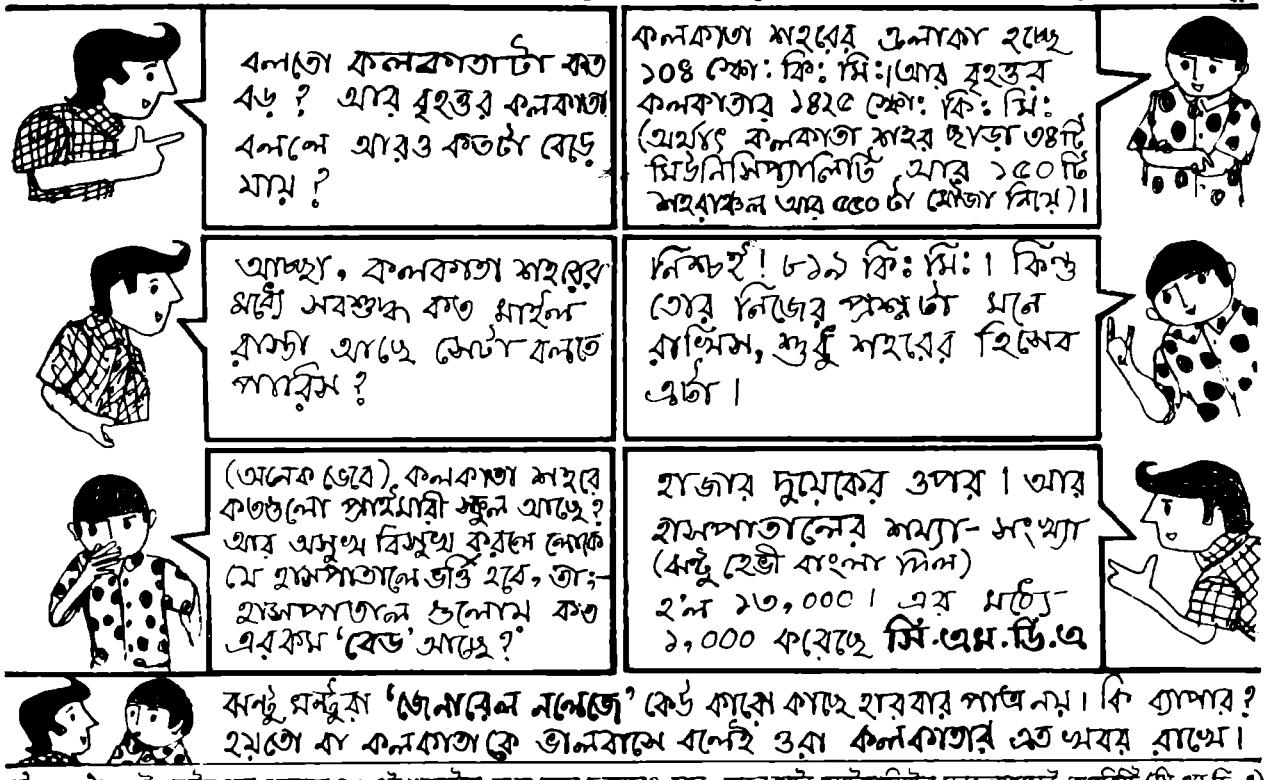

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

জেয়ারজিনো, রিভোলিনোদের দেখার জন্য ব্রাজিলের মানুষ পথে এসে দাঁড়ায়। খেলোয়াড়দের প্রাণ বাঁচলেই তখন পুলিসের প্রাণান্ত। সে-পাগলামি তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। পেলেকে নিয়ে কলকাতার মানুষ যত পাগলামি করেছে, তার চেয়ে হাজারগুণ। ভিড়ের চাপেই মারা গিয়েছিল ৪৪ জন।

আবার উল্টোটাও দ্যাখো। ইংলণ্ডে ১৯৬৬-র প্রতিযোগিতায় ব্রাজিল যখন ভাল খেলতে পারল না, একটি খেলা জিতে আর দুটি খেলা হেরে গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় নিল, তখন সারা ব্রাজিল শোকে আচ্ছন্ন। রাজধানী রিও ডি জেনিরোর মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার স্কোয়ারে তৈরি করা হল ফাঁসির মঞ্চ। তার নীচে লেখা হল, "আমরা কোচ ফিওলা ও নির্বাচক কমিটির সদস্যদের জন্য অপেক্ষা করছি। তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হবে। তাঁরা ব্রাজিলের সম্মান ও সুনাম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন।"

বিশ্বকাপ-ফুটবল নিয়ে পাগলামির কি শেষ আছে? এই পাগলামি আগে সীমাবদ্ধ ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে। যে আর্জেন্টিনায় এবার খেলা হচ্ছে, তারাও কম যায়নি। বিগত বিশ্বকাপের সময় ইউরোপেও কিন্তু তার ঢেউ এসে লেগেছে। পূর্ব জার্মানির বিরুদ্ধে চিলি গোল শোধ করার পর দক্ষিণ আমেরিকার সান্টিয়াগো থেকে খবর এল, লরেঞ্জো পার্ভো নামে এক উগ্র সমর্থক জ্বলন্ত স্টোভে লাথি মেরে আগুনে দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে শয্যা নিয়েছে, তার ঘরও পুড়ে গেছে। তার পরপরই রোম থেকে খবর এল, পোল্যাণ্ডের কাছে ইতালির পরাজয়ের পর সেখানকার পোলিশ দূতাবাসে হামলা হয়েছে, সেখানে টমেটো ও পাথর ছোঁড়া হয়েছে, টেলিভিশন সেট ভেঙেছে, জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়েছে। মরণাপন্ন অবস্থায় যুবকটিকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বহু বাড়ির জানলা দিয়ে শোকের চিহ্ন স্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কালো পর্দা।

হাসি, কান্না, আবেগ, আক্ষেপ, পুরস্কার, তিরস্কার এবং হই-হল্লার কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে বিশ্বকাপের খেলায়। তোমাদের মধ্যে যারা বড়, তাদের হয়তো ইউসেবিওর সেই ছবিটির কথা মনে আছে, যে-ছবিতে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাচ্চা ছেলের মত অঝোরে কাঁদছিলেন পর্তুগালের মস্ত খেলোয়াড়, লণ্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংলণ্ডের কাছে পর্তুগাল ১—২ গোলে হেরে যাবার পর। সেবার পেলের খেলাও ম্লান হয়ে গিয়েছিল ইউসেবিওর খেলার কাছে। দারুণ খেলেছিলেন। কেঁদেছিলেন হতাশায় এবং দেশের প্রতি অসাধারণ দরদ ছিল বলেই। গতবার আর্জেন্টিনার অধিনায়ক রবার্টো পারফুমো ইতালির সঙ্গে গ্রুপ লীগের খেলার সময় নিজের গোলে একটি বল ঢুকিয়ে একইভাবে কেঁদেছিলেন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আত্মঘাতী গোলটি না হলে ইতালি ওই খেলায় হেরে যেত, আর্জেন্টিনা জিতত। তাই কারো প্রবোধেই পারফুমোর চোখের জল থামেনি। জাতীয়তাবোধ এবং দলের ও খেলার প্রতি ভালবাসার কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে বিশ্বফুটবলের আসরে।

এই বিশ্ব-ফুটবলের জন্যই একটি বাচ্চা কুকুরের নাম বিশ্বখ্যাত হয়ে আছে। ইংলণ্ডে ৬৬-র প্রতিযোগিতা শুরু হবার কদিন আগে এক একজিবিশন থেকে সোনার পরীটি চুরি হয়ে গেল। খোঁজ-খোঁজ রব উঠল সারা ইংলণ্ডে। ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টও ভয়ানক বিচলিত। ইংলণ্ডের লজ্জার ব্যাপার তো। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দারা শত চেষ্টা করেও জুলে রিমে ট্রফিটি উদ্ধার করতে পারলেন না। অগত্যা একই ডিজাইনে অবিকল আর একটি ট্রফি তৈরি করার জন্য এক বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অর্ডার দেওয়া হল। তৈরি শুরু হবার আগেই কিন্তু সোনার পরীটি পাওয়া গেল। উদ্ধার করল একটি গ্রাম্য কুকুর। সে তার মনিবের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। একটা

এবারকার বিশ্বকাপ - ফুটবলের প্রতীক এই ছেলেটিকে চিনে রাখো

ভাঙাবাড়ির পেছন দিকে হঠাৎ দৌড়ে গেল। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে চুন-সুরকির রাবিশ খুঁড়তে আরম্ভ করল পায়ের নখ দিয়ে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়ল নিখাদ সোনায় তৈরি ফুটবলের বহুমূল্য ট্রফিটি। শুনেছ বোধ হয়, কুকুরটির নাম ছিল পিক্‌লস। ওয়েম্বলিতে ফাইনাল খেলার দিন ইংলণ্ডের রানীর পাশেই বিশেষ অতিথির আসন পেয়েছিল পিক্‌লস খেলা দেখার জন্য।

জুলে রিমে ট্রফিটির দাম কত ছিল জানো? তৈরি করতে খরচ পড়েছিল দু হাজার পাউণ্ড। ১৯৩০ সালে যখন তৈরি হয়, তখন সোনার ভরি ছিল ৩০ টাকার মত। এখন হিসাব করলে দাম দাঁড়াবে লক্ষ লক্ষ টাকা।

দ্যাখো, পেলের খেলা দেখার জন্য আমাদের কলকাতায় ৩০ টাকা বা ৬০ টাকার টিকিট কালোবাজারে অনেককে কিনতে হয়েছে দুশো আড়াইশো টাকায়। গতবার পশ্চিম জার্মানি ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার টিকিটের কালোবাজারি দর কত উঠেছিল শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ৩০ মার্কের টিকিট বিক্রি হয়েছিল ১৫০০ মার্কে। এক মার্ক আমাদের টাকার হিসাবে ৩ টাকা ৪৬ পয়সা। তাহলে হিসাব করে দ্যাখো, একখানা টিকিটের দাম উঠেছিল পাঁচ হাজার টাকারও উপরে।

এবার কেমন খেলবে তিন প্রধান

অশোক দাশগুপ্ত

ওরা দুজন একসঙ্গে সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসছিল। দুজনের হাত ধরতেই একজন বলে উঠল, "পিছনে তাকান। আরো আছে, মানস আর বিদেশ!" চারজনের মধ্যে এত যখন ভাব, তখন তোমরা ভাবতেই পারো, আগের দুজনও মোহন-বাগানের। কিন্তু না, ওরা ইস্টবেঙ্গলের মানিকজোড় ভাস্কর গাঙ্গুলি আর চিন্ময় চ্যাটার্জি। চারজনে দারুণ বন্ধুত্ব। কিন্তু—

মহমেডান স্পোর্টিং মাঠেও জোর তালিম চলছে

সাবির আলি

তাহলে একটু পিছিয়ে যেতে হয়। এবার দলবদল শুরু হবার দিন-তিনেক আগে এক ফুরফুরে সকালে বিদেশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শুনছি ভাস্করকেও নিতে চেষ্টা করছে মোহনবাগান?" ছোট্ট ডজে মাথামোটা ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নেবার মত আলতো ভঙ্গিতে বিদেশ বলল, "কী যে বলেন। ভাস্করই উল্টে আমায় বলেছিল, তুই আবার আমাদের টীমে চলে আয়।"

কেউ কোথাও যায়নি। মানস আর বিদেশ এবারও মোহন-বাগানের দুই ডানা। ভাস্কর আর চিন্ময় ইস্টবেঙ্গলের প্রাচীর। যতই গলায়-গলায় বন্ধু হোক চারজন, ময়দানে বল পড়লেই হৈহৈ কাণ্ড। বিদেশকে আটকাতে প্রাণপণ লড়বে চিন্ময়, মানসের চকিত শট থামাতে জান লড়াবে ভাস্কর। কিন্তু কে জিতবে এবার, বিদেশ-মানসের মোহনবাগান না ভাস্কর-চিন্ময়ের ইস্টবেঙ্গল?

ইস্টবেঙ্গল লীগ পেলেও গতবার ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে দেখিয়েছে মোহনবাগান। মোহনবাগানের প্রথম এগারোজনের একজনও দল ছাড়েনি। তার ওপর লাল-হলুদ জামা ছেড়ে এসেছে শ্যামল ব্যানার্জি। কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি এবং প্রধান কর্মকর্তা শৈলেন মান্নার তাই আশা, এবারও বাজি মাত করবে মোহন-বাগান। গোলে নতুন এসেছে এরিয়ান থেকে লক্ষ্মণ বেলেল, দলে আসার জন্য যে শিবাজীর ঘাড়ের কাছেই নিশ্বাস ফেলবে। ডীপ ডিফেন্সে এসে গেল শ্যামল ব্যানার্জি—ময়দানে যার নাম 'দ্বিতীয় সুধীর'। প্রসূন-গৌতম এখন শুধু মধ্যমাঠে নয়, মাঠের বাইরেও মোক্ষম জুটি। দুই প্রান্তে ডানা ঝাপটাবে বিদেশ আর মানস। মাঝখানে শ্যাম থাপা এক নম্বর। হাবিব আর আকবর তো আছেই। আর আছে সেই সুভাষ ভৌমিক, হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠায় যার কোনো জুড়ি নেই। পি কে এবং মোহনবাগান-কর্মকর্তাদের দুশ্চিন্তা শুধু একটাই: কেউ অসুস্থ হয়ে না পড়ে। আকবরের তো বারো মাস পেটে ব্যথা। কোঝিকোড়ে ন্যাগজী ট্রফি খেলতে যাবার আগেই অল্প চোট পেয়েছে বিদেশ। শ্যাম থাপাও মরশুমের গোড়াতেই বাধিয়েছে জণ্ডিস। তাই দুশ্চিন্তা। তবে ওদের

হাবিব

বিশ্বাস, সবাই সুস্থ থাকলে...

কিন্তু মোহনবাগানের সবাই সুস্থ থাকলেই কি মোহনবাগান জিতে যাবে? ইস্টবেঙ্গলের এক উঠতি ডিফেন্ডারের ভাষায়: "আমরা কি ঘাস কাটব?"

গোলে যাদের ভাস্কর, তারা তো অর্ধেক নিশ্চিন্ত। চিন্ময় চ্যাটার্জি এখন অনেকের মতে ভারতের সেরা সাইড ব্যাক। মাঝখানে ঠান্ডা মাথায় শ্যামল ঘোষ, যে শুধুই আক্রমণ ভাঙে না, পাল্টা আক্রমণ গড়ে। পাশে তেজী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। আর আছে তরুণ মুখিয়া, গতবার যার নাম ঘুরেছে মুখে-মুখে। তরুণ মুখিয়া আর এরিয়ান থেকে আসা সমীর মুখার্জিও লড়বে দলে আসার জন্য। কিন্তু শ্যামল ব্যানার্জির জায়গা নেবে কে? শ্যামল ঘোষ বলছে, খুব সহজেই নেবে সত্যজিৎ মিত্র অথবা ইস্টার্ণ রেল-থেকে-আসা রবীন দাস। সুতরাং ডীপ ডিফেন্স এবারও মজবুত। আর হ্যাঁ, দলে ফিরে এসেছে ভাস্করের গুরু তরুণ বসু। গত বছর ৯ জুলাই লীগ-ম্যাচে দারুণ খেলে ইস্টবেঙ্গল টীম যখন টেন্টে ঢুকছিল, অনেক লোকের মধ্যে একজন তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে হাতের মুঠোয় একশো টাকার নোট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাস্করকে দেখেই সেই একজন, ভাস্করের গুরু তরুণ বসু জড়িয়ে ধরে তার হাতে নোটখানা গুঁজে দিয়েছিল। গুরুকে ফিরে পেয়ে ভাস্কর এবার খুব খুশি।

মাঝমাঠে এবারও লাল-হলুদের প্রথম ভরসা পিন্টু চৌধুরী। কিন্তু কেমন খেলবে আরেক লিংকম্যান প্রশান্ত ব্যানার্জি? গত-বার লীগের শেষদিকে আর শীল্ড ফাইনালে প্রশান্ত ভাল খেলতে পারেনি। কিন্তু অমল দত্ত বলেছেন, বাইরে প্রশান্ত ভাল খেলেছে। এবারের কোচ অরুণ ঘোষও মনে করেন প্রশান্ত ভাল খেলবেই। অতিরিক্ত হিসাবে থাকছে জর্জ টেলিগ্রাফ-থেকে-আসা সুবিমল ঘোষ, সোভিয়েট রাশিয়ার টীম পাখতাকোরের দুর্দান্ত স্ট্রাইকার ফেদারভকে যে গায়ে-লেগে-থেকে অকেজো করে দিয়েছিল।

সুরজিৎ আর উলাগা এবারও বিপক্ষের ভয়ের কারণ। অশোক চন্দও কম যায় না। বি এন আরের এই চতুর উইঙ্গার মাঝখানেও মানিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত সাবির আলি যদি খেলতে পারে, ওর সঙ্গে লাল-হলুদের হয়ে কামান দাগবে কে? গতবারের টপ স্কোরার রঞ্জিত মুখার্জি? কিন্তু মিহির বসুও তো এবার বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না। তা ছাড়াও আছে এরিয়ান-থেকে-আসা তপন দাস, যে কিনা যখন-তখন প্রথম দলে ঢুকে যেতে পারে। এবারের ক্যাপ্টেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত তাই বলছে, মাঝ-মাঠের ব্যাপারটা ঠিকঠিক চললে টীম ভাল খেলবেই।

এবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কোচ অতীতের বিখ্যাত ব্যাক রহমান। রহমানের আশা, টীম ভাল খেলবে। তরুণ বসু দল ছাড়লেও এসেছে রাজস্থান থেকে নাসির আমেদ। ইস্টার্ন রেলের লড়িয়ে স্টপার অশোক চক্রবর্তীও এবার মহমেডানের দুর্গ আগলাবে। হাবিব খান, শ্যাম কর্মকার আর আনোয়ার হোসেন তো আছেই। তাছাড়া অনুমতি পেলে আসবে স্টপার ছাতুনি। মাঝমাঠে পলরাজ ছাড়া বাইরে থেকে আসতে পারে অমলরাজ। ফরোয়ার্ড লাইনে সাজ্জাদ, লতিফুদ্দিন আর আজিজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এরিয়ানের নাসিম আলি এবং জর্জ টেলিগ্রাফের মুকিম। সাদা-কালোর সুদিন কি আবার ফিরবে?

এই তিন প্রধান ছাড়াও দারুণ টীম করেছে জর্জ টেলিগ্রাফ আর এরিয়ান। অন্য সব ছোট টীমেও ছড়িয়ে আছে ভবিষ্যতের স্টার ফুটবলারেরা। যদি জর্জ টেলিগ্রাফের গোলে বল ঢোকাতে হিমসিম খায় মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল, তবে জেনে রাখো, গোল-লাইনে দাঁড়ানো ঐ রোগা কিন্তু একরোখা ছেলেটির নাম অমিত গুহ। যদি কুমারটুলির এক ছোট্ট লিংকম্যানকে দ্যাখো ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁত বল বাড়াতে, তবে বুঝে নেবে, ওর নাম অলোককান্তি দাস। যদি এরিয়ানের কোনো স্ট্রাইকারের ঘূর্ণি-শটে হঠাৎ ঘটে কোন বড় টীমের বিপর্যয়, তবে জেনে নেবে, ওর নাম শঙ্কর অধিকারী। আর নেহাতই দুর্বল স্পোর্টিং ইউনিয়নের একটি কালো ছেলের চমৎকার গোল দেখে যদি চমকে ওঠো, তবে নিশ্চিত বুঝে নেবে, ওর নাম কালিপদ হালদার, পঞ্চাননতলার বস্তিবাড়িতে থেকেও যে এখন উলাগা হবার স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে।

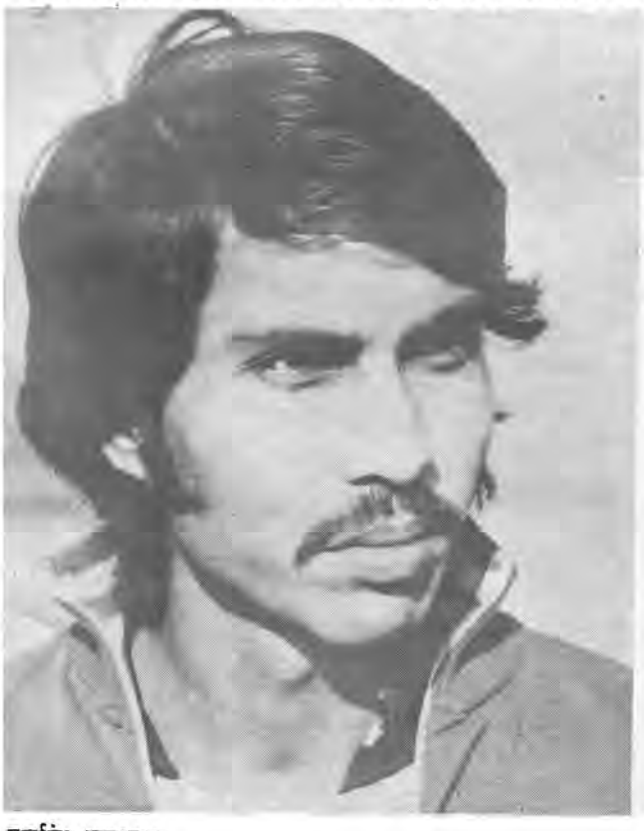

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

গৌতম সরকার

অপ্রিয় ইতিহাস

ফাইভার

যাই-যাই শীতের বিকেল। হাল্কা চাদরের নীচে শুয়ে দারুণ জমিয়ে পড়ছি নেভিল কার্ডাসের 'অস্ট্রেলিয়ান সামার'। ২—০ টেস্টে পিছিয়ে থাকা সিরিজে একা ব্রাডম্যানের ব্যাট কী করে ফিরিয়ে আনল অস্ট্রেলিয়াকে—সেই কাহিনীর শুরু উনিশশো সাঁইত্রিশের পয়লা জানুয়ারি—তাতেই ডুবে আছি। এমন সময় একটি অভাবনীয় সংলাপ আমার মনোযোগ চুরমার করে দিল। শুনলাম, বারান্দার রেলিংয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আমার এগারো বছরের তালেবর ভাইপো রাজা বলছে, "এই চিন্কা, এদিকে আয়, আলুর চপ খা।"

আলুর চপের মতো জিনিস ডেকে খাওয়ানোর ইচ্ছা দেখে চিন্কার কেমন যেন সন্দেহ হল। তবু, আলুর চপ যখন, দাঁড়াতেই হয়। চপটা চিন্কার হাতে দিয়েই রাজা শুরু করল, "মুখ শুকনো করে থাকিস না ভাই। না হয় আমরা ত্রিমুকুটই পেয়েছি। তোরাও চেষ্টা কর। দুঃখ করে কী হবে!"

তখনকার মতো মেলবোর্নের ভিজে পিচ থেকে মন সরিয়ে বারান্দার মধুর কথাবার্তায় কান দিতে হল। রাজা আর চিন্কার বন্ধুত্ব তো খুব। কিন্তু ঐ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কথা উঠলেই মুশকিল। কতবার যে আমি মারামারি থামিয়েছি!

মুখে রাজার দেওয়া আলুর চপ। চিন্কা কোন স্বাদ পেল না। চোখ দুটো জ্বলছে। ভাবখানা এই : "বুঝেছি, এই জন্য এত মিষ্টি করে ডাকা।" তবু চিন্কাও তো কম যায় না। খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, "তা অবশ্য ঠিক। আমাদের একটু দুঃখ আছে। ১৯৭২ সালে ত্রিমুকুট ইস্টবেঙ্গল পেয়েছে। তবে রোভার্সে ভাগ্যভাগি ছিল। তবু পুরোপুরি ত্রিমুকুট পাইনি বলে দুঃখ হয়। তোদের অবশ্য দুঃখ-লজ্জার বালাই নেই। ১৯৭৫-এ শীল্ড ফাইনালে পাঁচ গোল খাওয়ার কথাটা তো ভুলেই গেছিস। দুঃখ-টুঃখ আর হবে কী করে!"

চিন্কার মুখে এত বড় বক্তৃতা শুনে রাজা মোটেই চটল না। আমারই তো ভাইপো। বেশ নিরীহভাবে বলল, "ছিঃ চিন্কা, রাগ করে না। আগের কথা মনে করতে গেলে তো ১৯১১ থেকে শুরু করতে হয়।"

চিন্কা যেন ধনুক থেকে তীরের মতো বেরিয়ে এল, "আর ঐ শীল্ড জেতার গল্প কত বলবি। নতুন কিছু ছাড়।"

রাজা খুব উদাসভাবে জানাল, "না রে, আজ খুব পুরনো কথা মনে পড়ছে। হকি ক্রিকেটে তো মোহনবাগানের কাছে ইস্টবেঙ্গল পাত্তা পেত না। এক ঐ ফুটবল। তাতেও তো একবার সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে গিয়েছিল!"

জানালা দিয়ে দেখলাম, চিন্কার ফর্সা মুখখানা কালো হয়ে গেল। এই একটা কথা তুললেই চিন্কা কেন, ইস্টবেঙ্গলের সব সাপোর্টারই চুপসে যায়। আমি নিরপেক্ষ লোক। কিন্তু চিন্কার অবস্থা দেখে মায়া হল। তাই বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললাম, "কিন্তু রাজা, চিন্কার ক্লাবের নামা এবং ওঠার কাহিনীটা ভাল করে জেনে রেখো।"

১৯২৮ সালে সবাইকে অবাক করে ইস্টবেঙ্গল লীগ টেবিলে সবার নীচে থেকে সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে গেল। সেবার ক্যাপ্টেন ছিলেন মণি দাস। ১৮টা খেলায় মাত্র ৯ পয়েন্ট পেল ইস্টবেঙ্গল। অবস্থা ছিল এইরকম :

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
১৮	২	৫	১১	৯

১৯২৯ সালে দারুণ খেলেও দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। হল রানার্স। ১৯৩০-এ লীগ টেবিলের মাথায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠায় কলকাতার লীগ খেলা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ১৯৩১ সালে চিন্কার ইস্টবেঙ্গলকে আর দাবিয়ে রাখা গেল না। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাথা উঁচু করে প্রথম ডিভিশনে ফিরে এল ইস্টবেঙ্গল। আর সে কী ভয়ঙ্কর ফিরে আসা! পাঁচ বছর বাদেই ১৯৩৬-এ লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগানকে দিল ৪ গোল। গোল করল লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ, মজিদ আর কে প্রসাদ। সুতরাং রাজা—"

কিন্তু আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে চিন্কা বলে উঠল : "কিন্তু নেমেছিল তো!"

এবার আসল বোমাটা ছাড়লাম। "কিন্তু আমি যদি বলি মোহনবাগানও সেকেন্ড ডিভিশনে নেমেছিল?"

চিন্কা আর রাজা দুজনেই অবিশ্বাসের চোখে তাকাল। রাজা বলল, "ভ্যাট!"

ধীরে-ধীরে শুরু করলাম, "হ্যাঁ বৎস, নেমেছিল। ফুটবলে নয়, তবে যা নিয়ে তোমাদের গর্ব কম নয়, সেই হকিতে। ১৯০৯ সালে প্রথম ডিভিশন হকি লীগে সবচেয়ে নীচে ছিল মোহনবাগান। ১৩টা খেলায় মোহনবাগান কত পয়েন্ট পেয়েছিল জানো? শূন্য! তিনটি গোল দিয়ে খেয়েছিল ৩৪টি গোল। ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল তবু তিন বছরের মধ্যে প্রথম ডিভিশনে ফিরে এসেছিল। হকিতে কিন্তু মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পনেরো বছর, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ১৯০৯ সালে প্রথম ডিভিশন হকি লীগ টেবিলে মোহনবাগানের অবস্থা ছিল এইরকম :

খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	পয়েন্ট
১৩	০	০	১৩	০

তাহলেই বোঝো।"

আমার কথা ফুরোতেই দেখি চিন্কা এক দৌড়ে কোথায় চলে গেল। ফিরে এল দু মিনিটের মধ্যে। ঠোঙা থেকে গরম আলুর চপ তুলে রাজার অনিচ্ছুক হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "দুঃখ করিস না রাজা, আলুর চপ খা।"

খেলার মজা

স্কীমার

ক্যাচ ধরেছি, ক্যাচ ধরেছি!

অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় এক ছুটির দিনে ইংল্যান্ডের স্বনামধন্য ব্যাটসম্যান প্যার্টাস হেনড্রেন একদিন গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে দুই দলের ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে অনুরোধ করা হল, একটি দলে খেলার জন্যে। খেলা শুরু হল। তাঁকে ফিল্ড করতে পাঠানো হল লং অনে, একটু দূরে একটা ঢিবি পেরিয়ে। ঢিবির আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি খেলার কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। হঠাৎ একটি উঁচু ক্যাচ এল। তিনি ক্যাচটি ধরে দৌড়তে-দৌড়তে ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে চলে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ক্যাচ ধরেছি!"

যে দলে তিনি খেলছিলেন, সেই দলের অধিনায়ক ব্যাট হাতে এগিয়ে এসে রেগেমেগে বললেন, "ওখানে আপনি কী করছিলেন? ওরা তো অনেকক্ষণ আগেই আউট হয়ে গেছে। এখন আমরা ব্যাট করছি, এটা আমার ক্যাচ।"

হকিতে বিশ্বকাপ গেল পাকিস্তান

দ্বাদশ ব্যক্তি

মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকসের হকি টুর্নামেন্টে ভারত সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল। তার তুলনায় বুয়েনস এয়ারসে গত এপ্রিল মাসের গোড়ায় যে চতুর্থ বিশ্বকাপ-প্রতিযোগিতা শেষ হল, তাতে ষষ্ঠ হওয়া সামান্য উন্নতিরই চিহ্ন। তবে তাই বলে তো এদেশের কোনও হকি অনুরাগীকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। হকিতে ভারত ছিল বিশ্বকাপ-চ্যাম্পিয়ন, আর এখন সেটি চলে গেছে পাকিস্তানের দখলে।

হলাউদ্দীন। পাকিস্তান হকি দলের অধিনায়ক

মন্ট্রিয়লে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল পাঁচ গোলের ব্যবধানে : স্কোর ছিল ৬-১। ওয়ার্ল্ড কাপের ঠিক আগেই করাচিতে পাকিস্তান আমাদের হারায় ৬-০; আর বুয়েনস এয়ারসে ভারতের "রেকর্ড"-ব্যবধানে পরাজয়ের মাত্রা পাঁচ, ছয় ছাড়িয়ে সাতে দাঁড়ায়, যখন আমাদের চতুর্থ খেলায় পশ্চিম জার্মানি ৭-০ গোলে জেতে। রেডিও-ভাষ্যকাররা নাকি বলেছিলেন, ভারত লড়ে হেরেছে। তাঁরা হয়তো এই বলতে চেয়েছিলেন, প্রতিটি গোলই জার্মান দল খেটে দিয়েছে, তাদের একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তবে একটি-দুটি গোলে হারা এক কথা, আর সাত-সাতটি গোলে হারা অন্য ব্যাপার।

তার আগের খেলাতেই কিন্তু ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল; আর প্রতিযোগিতার পরের দিকে অস্ট্রেলিয়াই পশ্চিম জার্মানিকে পরাজিত করে ৩-২ গোলে। ভারতের গ্রুপে এমন উল্টো-পাল্টা ফলাফল কতগুলি হয়। আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারালাম, অস্ট্রেলিয়া কানাডাকে হারাল ৪-০, আবার কানাডা ভারতকে ৩-১'এ পরাজিত করল। ওদিকে কানাডা পোল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হারল, আর পোল্যান্ড যে খালি ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় হারল তা নয়, জার্মানদের কাছে খেল ন'টি গোল!

গ্রুপ ম্যাচগুলির ফলাফল পরে বিচার করলে দেখা যায়, ভারত যদি কানাডাকে হারাত, তাহলে পশ্চিম জার্মানির কাছে অমনভাবে হেরেও তাদের আগে এসে যেতে পারত, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমি-ফাইনালে উঠে যেত। তবে অবাক কথা এই যে, কানাডার কাছে ভারত যে হারতে পারে, সে-কথা মনেই হয়নি, কারণ এর আগে অবধি আন্তর্জাতিক হকিতে কানাডার রেকর্ড মোটেই সুবিধার ছিল না। কিন্তু ভারতের সঙ্গে খেলার দিন কানাডা হাফ-টাইমে এক গোলে পিছিয়ে থাকলেও প্রথম থেকেই খুব সুন্দর, গুছিয়ে খেলেছিল

বুয়েনস এয়ারসে প্রতিযোগিতার সময় অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি হয়, বেশ কিছু দিন। ফলে মাঠের অবস্থা সাধারণের থেকে অনেক বেশি "হেভি" ছিল। এতে ভারতের অসুবিধা হয়, কারণ ভারতের যে ধরনের খেলা—তা ভালভাবে প্রকাশ করতে হলে নিখুঁত বা ঘাসের মাঠ দরকার। এদিকে পাকিস্তানও একই রকমের মাঠে খেলতে অভ্যস্ত। কিন্তু কই, "হেভি" মাঠে তাদের তো কোনও অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয়নি। সত্যি কথা এই, পাকিস্তান প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য সব দিক দিয়েই অনেক বেশি তৈরি ছিল।

ভারতের অবস্থা মন্ট্রিয়লে যেমন ছিল, বুয়েনস এয়ারসেও অনেকটা সেইরকমই হল। মন্ট্রিয়ল থেকে যা শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল, তা একেবারেই হয়নি। আমরা একটা টুর্নামেন্ট হারলেই কোচ পালটাই। মন্ট্রিয়লের পর তাই গুরুবক্স সিংয়ের কোচ-পদ গেল, কিন্তু তাঁর বদলে কে নতুন আসবেন তা স্থির করতে বহু দিন লাগে। রণধীর সিং জেন্টল কোচ হবার পর আবার কোনও সময়েই ঠিক মতন বুঝতে পারেননি যে, শেষ অবধি তিনি কোন্ কোন্ প্লেয়ারকে দলে পাবেন, তাই সেই মতন খেলার কৌশলও ফাঁদতে পারেননি। কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে সিলেক্টরদেরও দোষ দেওয়া যায় না : তাঁদের বলা হয়েছিল—"এই খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে দল বানাও"। আর "এই খেলোয়াড়দের" মধ্যে অনেকেই ছিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে "টেস্ট" খেলায় সুবিধা করতে না-পারায় নির্বাচকদের বলা হয়, এই চারজন প্লেয়ারকে এবার দলে নিতে হবে

ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা যে কখন কী করে বসবেন, কিছুরই স্থিরতা থাকে না। ফলে ভারতীয় দলই ভোগে। মন্ট্রিয়ল বিপর্যয়ের মাস চারেকের মধ্যেই নতুন কোচ ঠিক করা হলে তাঁর মতামত আর প্রয়োজন অনুসারে দল গড়া যেত—হল্যান্ড বা পাকিস্তানের সঙ্গে "টেস্ট" খেলাগুলিতে এক্সপেরিমেন্ট না চালিয়ে নির্বাচিত ওয়ার্ল্ড কাপ দলকে ভালমতন গড়া যেত। পাকিস্তান এর মধ্যেই ডিসেম্বরে এশিয়ান গেমস হকির জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা?

তবে সব কিছু বলার পর এটাও স্বীকার করতে হবে—আমাদের দলে এমনিতেই অনেক দুর্বলতা ছিল, আছে, আপাতত থাকবেও। আমাদের গোলকিপার ভাল নেই, ফুল-ব্যাকেরা একবার একটু এগিয়ে গেলে পিছিয়ে আসতে বড্ড সময় নেন, আমাদের সেন্টার হাফ নেই, আমাদের আক্রমণের ধার কম। অজিতপাল সিং মন্ট্রিয়লে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু অন্য কেউ না-থাকায় এবার কথা উঠেছিল, তাঁকেই বুয়েনস এয়ারসে সেন্টার-হাফ করে নিয়ে যাওয়া হোক। সত্যি কথা ভাবলে মনে হয়, আমরা আর হকিতে ভাল করব কী করে—তেমন প্লেয়ার আর আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে কোথায়?

ববির বিদায়

গত মার্চ মাসের শেষের দিকে যে-দিন ১৯৫২ হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কুঁয়ার দিগ্বিজয় সিং "বাবু"র লখনৌতে মৃত্যুর খবর আমরা পেলাম, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা করেছিলাম তাঁর সেকালের টিম-মেট লেসলী ক্লডিয়াসের সঙ্গে। "বাবু"র কথা থেকে আলোচনার মোড় ঘুরেছিল বুয়েনস এয়ারসে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায়—যেখানে ক্লডিয়াসের সেজো ছেলে ববি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছিল। "ববি তো আপনার মতনই রাইট-হাফের প্লেয়ার," ক্লডিয়াসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তার খেলা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?" ক্লডিয়াস সোজাসুজি বলেছিলেন, "আমার ববি ঠিক তৈরি হবার আগেই জাতীয় দলে এসে গেছে। তার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। তবে তার বয়স তো খুবেই অল্প, ববির হকি-ক্যারিয়ারের এইতো সবে শুরু।"

সেদিন কেই বা ভেবেছিল যে, সপ্তাহ দুয়েক বাদেই ববি ক্লডিয়াসের হকি খেলা কেন, তার ১৯ বছরের জীবনটাই হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে। আর্জেন্টিনা থেকে ববি কলকাতায় বাড়ি ফেরে শনিবার, ৮ই এপ্রিল : আর রবিবার মাঝরাত-বরাবর এক মিউজিক কার্নিভাল থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরবার পথে সে তার বন্ধুর -কুটারের পিছন থেকে পড়ে গিয়ে এক চলন্ত লরির চাকার তলায় প্রাণ হারায়।

লেসলী ক্লডিয়াসই প্রথম ভারতীয়, যিনি চারটি অলিম্পিক খেলেন। আর ছেলে ববি এত কম বয়সে ভারতীয় দলে ঢোকায় অনেকেই হয়তো ভেবেছিল যে, এও নিশ্চয় বহুবার অলিম্পিকে যাবে। ববির ভাল নাম রবার্ট অ্যালেন ক্লডিয়াস—জন্ম কলকাতায়, ১৯৫৯-এর ১০ মার্চ। তার লেখাপড়া আর খেলা শেখা আসানসোলের সেন্ট ভিন্সেন্ট স্কুলে : সেখান থেকেই জুনেতে ১৯৭৮-এর জুনিয়ার ন্যাশনালে বাংলার হয়ে খেলে, আর বছরের শেষের দিকে ভারতীয় জুনিয়ার টিমের সঙ্গে জার্মানিতে যায়।

তার খেলায় যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সেটা লক্ষ করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ববিকে স্পোর্টস স্কলারশিপ দেয়, আর গত বছর মাদ্রাজে জাতীয় হকিতে সে এয়ারলাইন্সের হয়ে নামে। তার পরেই কুয়ালালামপুরে জুনিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপের এশীয় পর্যায়ের খেলায় ববি ছিল ভারতের অধিনায়ক। ১৯৭৭-এর শেষাশেষি সে সফরকারী হল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম একাদশে খেলবার সুযোগ পায়। আর মাসদুয়েক বাদেই তো ভারত-পাকিস্তান "টেস্ট" তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ।

ববি ক্লডিয়াস হয়তো ভারতীয় হকিতে তার বাবার মতনই বিরাট বড় প্লেয়ার হতে পারত। তবে সে-সুযোগ তার কপালে ছিল না। ক্লডিয়াসদের বাড়ির এক কোণে যেমন সদ্য-আর্জেন্টিনা ফেরত ববির সুটকেস প্রায় পুরো প্যাকড্ অবস্থায় পড়ে ছিল, ববির খেলার ক্ষমতাও তেমনিই খালি একটুমাত্র দেখা গিয়েছিল। বাকিটা আর প্রকাশ পেল না।

সুব্রত সরকার

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

১২ মার্চ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে মণিমেলা সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে দেড় হাজারের মত মণিভাইবোন মার্চ পাস্ট, ড্রিল, জিমন্যাস্টিকস, আসন, ছড়ার গান ও লোকনৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান-সভাপতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন, গত ৩৮ বছর ধরে মণিমেলা এদেশের শিশু ও কিশোরদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে কাজ করে আসছে, তা অতীব প্রশংসনীয়। প্রধান অতিথি, জয়েন্ট কমিশনার অব পুলিশ শ্রীপার্থ বসু চৌধুরী মার্চ পাস্টে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, মণিমেলা আজ সকলের পরিচিত ও অতি আদরের বস্তু। বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত।

আঞ্চলিক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আন্তঃ মণিমেলা স্পোর্টসে দক্ষিণ বারাসত মণিমেলা চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। বনগাঁ আঞ্চলিক আন্তঃ মণিমেলা কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় অশোকনগর মণিমেলা ও সীমন্তিকা মণিমেলা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। বেহালা আঞ্চলিক মণিমেলাগুলি কিশোরকল্যাণ-দিবস সুষ্ঠুভাবে পালন করে।

আসানসোল আঞ্চলিক আন্তঃ মণিমেলা 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়েছে সর্বশ্রী অনির্বাণ সরকার (সিস্টার নিবেদিতা মণিমেলা), সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় (রেলপার মণিমেলা) ও প্রভাকর দেবরায় (সিস্টার নিবেদিতা মণিমেলা)।

মণি সন্দেশ

গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলা বোটানিকেল গার্ডেনে সম্প্রতি একদিনের এক শিক্ষণ-শিবিরের আয়োজন করেছিল। বিরাটির পল্লী মণিমেলার বাৎসরিক উৎসব সম্প্রতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

হাওড়া হীরাপুরের পল্লীমঙ্গল মণিমেলা এক ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলা-আয়োজিত ক্রীড়া প্রদর্শনী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ পরগনার নবরবি মণিমেলার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষে একটি সুন্দর ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরাহনগরের রবীন্দ্রপল্লী মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

২৪ পরগনার গড়িফা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মণিমেলা আয়োজিত ছোটদের আবৃত্তি ও ক্যারম প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। শ্যামনগরের পিরতলা সারথি মণিমেলা স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। হাওড়ার স্বামীজি মণিমেলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।

হাওড়ার স্বামীজি মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোলের সোনারতরী মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ উৎসাহের মধ্যে সমাপ্ত হল। কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলার বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলার ভাইবোনেরা বাসে করে দেওঘর, রাজগির, নালন্দা, গয়া, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে এক শিক্ষা-ভ্রমণে গিয়েছিল। হুগলির আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার ভাই-বোনেরা গয়া, বুদ্ধগয়া, বেনারস, কাশী ও সারনাথে এক শিক্ষা-ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসেছে।

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

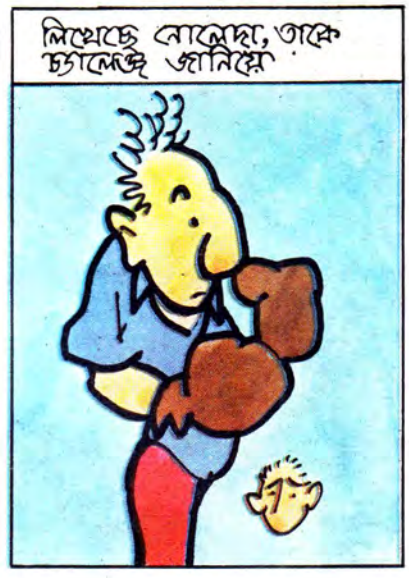

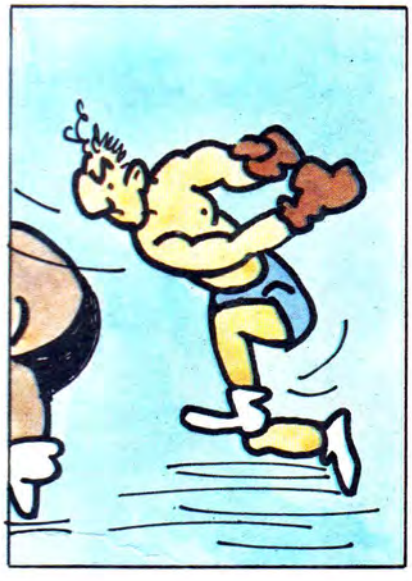

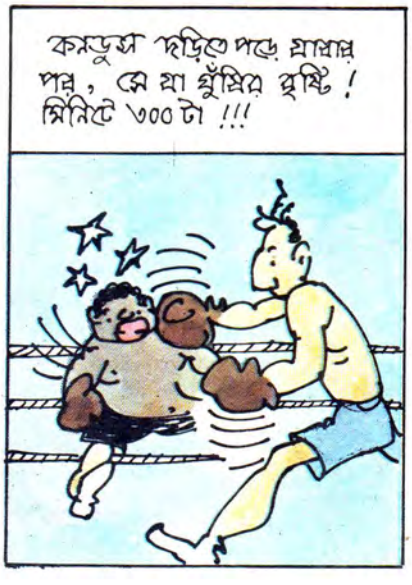

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

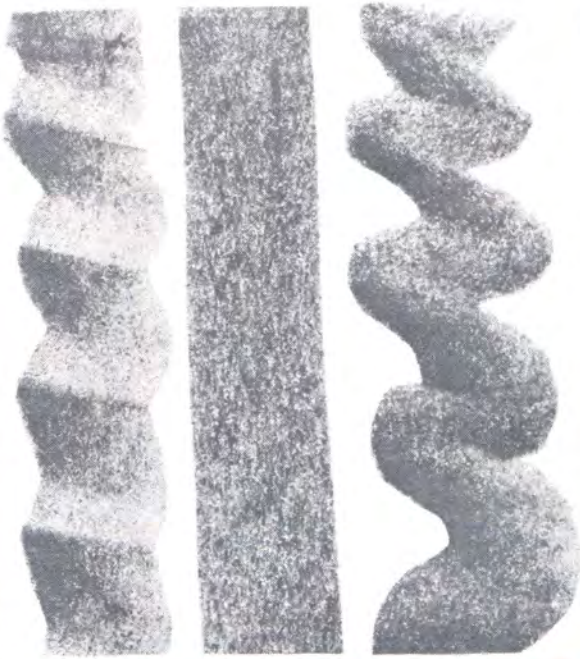

প্যাস্টেলের কাজের নমুনা আগেই দেখেছ। এবারের নমুনায় যে কমবেশির চাপের ওপর আলোছায়ার আর আকারের কত উঁচু-নিচুর পরিবর্তন ঘটে, তা দেখালুম।

তোমরা রঙের টুকরো নিয়ে আড়াআড়ি উঁচু-নিচু করে টেনে নানান আকার করার চেষ্টা করে দেখো, কত সুন্দর-সুন্দর অসম্ভব সব ব্যাপার ঘটছে। প্র্যাকটিস করার জন্যে ব্ল্যাকবোর্ড বা স্লেট ব্যবহার করতে কোথাও বাধা নেই, তবে এতে রঙিন চক্ ব্যবহার করতে হবে, প্যাস্টেল নয়।

শেখো

কারিগর

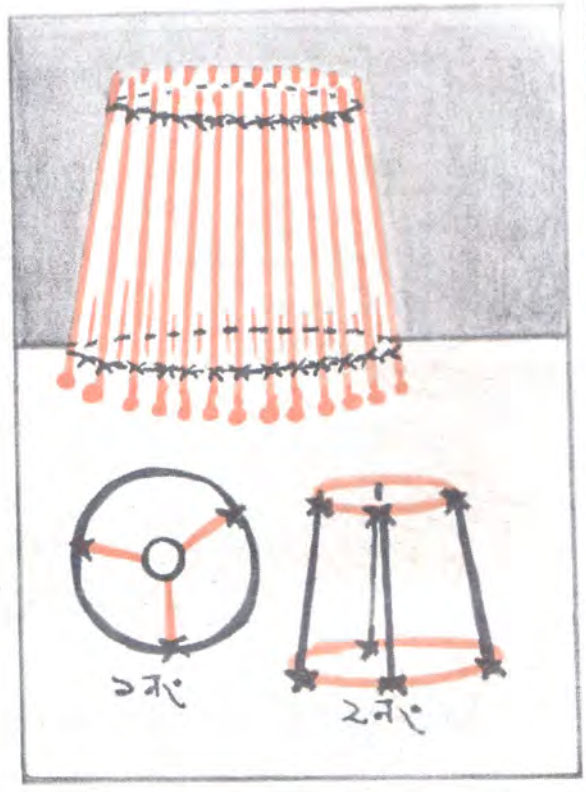

বাতিদানের ঢাকা

বাঁশের কাজের জন্য জোগাড় করা জিনিস দিয়েই শুরু করো—নকশা-মাফিক বাঁশের পাতি নিয়ে তার শেষ দু' অংশ চেঁছে এমনভাবে পাতলা করে নাও, যাতে দু' অংশ এক সাথে জুড়লে সমান মোটা হয়। এমনভাবে ওপর-নীচের গোল দুটি করে নাও। এবার যে গোল অংশ নীচের দিকে থাকবে, তার মধ্যে আর একটি গোল করে (১নং ছবি) কাঠি দিয়ে বেঁধে নাও। গোলটির মাপ আলোর হোলডারের মাপ অনুযায়ী যেন হয়।

বাতিদানের ঢাকাটির দৈর্ঘ্য অনুসারে ছোট ছোট গোল কঞ্চি বা পাতলা পাতি তৈরি করে নাও। এবার প্রথমেই ভাগ অনুযায়ী দুটি গোলকে চাবটে পাতিতে একটু ফেভিকল আর দড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে নাও (২নং ছবি)। ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেলে অন্য পাতিগুলো পর পর তফাত অনুযায়ী একই দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওপর নীচের দুটো গোলেরই বাঁধার কাজ শেষ করে, আলো জেবলে দ্যাখো কী-রকম লাগছে। ইচ্ছে করলে ঢাকার ভেতর দিকের গায়ে রঙিন পাতলা কাপড় লাগিয়ে দিয়ে দেখতে পারো কেমন বাহার হয়।

জেনে রাখো—(১) ফেভিকল দিয়ে পাতি জুড়ে দড়ি দিয়ে কিছু সময়ের জন্য বেঁধে রাখো। (২) বাঁধনের বাহারের জন্য রঙিন দড়ি ব্যবহার করতে পারো। (৩) বাঁধার কাজে নাইলন-সুতো ব্যবহার না করাই ভাল। (৪) বাঁশের পাতি বা কাঠিতে রং দিয়ে কাজ করতে পারো। (৫) নীচের মাঝের ছোট গোলটি ও তার বাঁধার কাঠিগুলি তার দিয়ে করতে পারলে খারাপ নয়। (১নং চিত্র)

কয়েক ফোঁটা ছড়িয়ে দাও

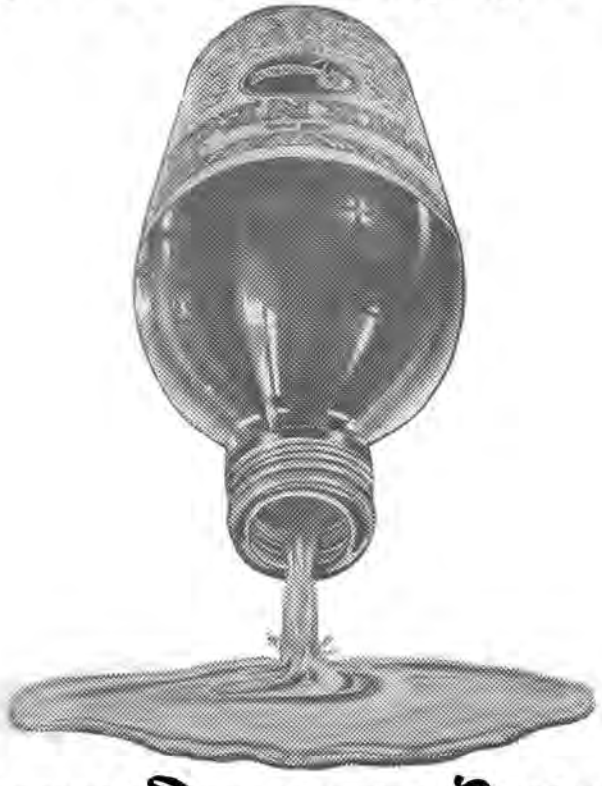

রোগজীবাণু সব উধাও!

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর

ব্র্যান্ড

ফিনিয়ল

* ঘনীভূত জীবাণুনাশক। মাত্র কয়েক ফোঁটা (এক বালতি জল সাদা করার পক্ষে যথেষ্ট) লক্ষ লক্ষ জীবাণু ধ্বংস করে। নামমাত্র খরচে সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক!
* এর তীব্রগন্ধ তেলাপোকা, মাছি, পিঁপড়ে এবং বাড়ি-ঘরের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গদের তাড়িয়ে দেয়। দুর্গন্ধও দূর করে!
* বাড়ি, হাসপাতাল, আরোগ্যশালা, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা এবং শিল্পসংস্থাসমূহে ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ!
* ৪৫০ মিলিলিটার বোতলে এবং ৪ লিটার ও ২০ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ফিনিয়ল

—কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘনীভূত রোগজীবাণুনাশক

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস লিঃ

(ভারত সরকার পরিচালিত)

ASP/BC-1/78 BEN

everest/871/PP-